চন্দ্রনাথ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দেড় টাকা

চতুর্দ্দশ সংস্করণের বিজ্ঞাপন

চন্দ্রনাথ গল্পটি আমার বাল্য রচনা। তখনকার দিনে গল্পে উপন্যাসে কথোপকথনে যে ভাষা ব্যবহার করা হইত এই বইখানিতে সেই ভাষাই ছিল। বর্ত্তমান সংস্করণে মাত্র ইহাই পরিবর্ত্তিত করিয়া দিলাম। ইতি, ১৮ই আশ্বিন ১৩৪৪

গ্রন্থকার

উনবিংশ সংস্করণ

শরৎ চন্দ্র

চন্দ্রনাথ

প্রথম পরিচ্ছেদ

চন্দ্রনাথের পিতৃ-শ্রাদ্ধের ঠিক্ পূর্ব্বের দিন কি একটা কথা লইয়া তাহার খুড়া মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের সহিত তাহার মনান্তর হইয়া গেল। তাহার ফল এই হইল যে, পরদিন মণিশঙ্কর উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার অগ্রজের পারলৌকিক সমস্ত কাজের তত্ত্বাবধান করিলেন, কিন্তু একবিন্দু আহার্য্য স্পর্শ করিলেন না, কিম্বা নিজের বাটীর কাহাকেও স্পর্শ করিতে দিলেন না। ব্রাহ্মণ-ভোজনান্তে চন্দ্রনাথ করযোড়ে কহিল, কাকা, দোষ করি, অপরাধ করি, আপনি আমার পিতৃতুল্য, আমি আপনার ছেলের মতো—এবার মার্জ্জনা করুন।

পিতৃতুল্য মণিশঙ্কর উত্তরে বলিলেন, বাবা, তোমরা কলকাতায় থেকে বি-এ, এম-এ পাশ করে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হয়েছ, আমরা কিন্তু সেকেলে মূর্খ, আমাদের সঙ্গে তোমাদের মিশ খাবে না। এই দেখ না কেন, শাস্ত্রকারেরাই বলেছেন, যেমন গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা।

শাস্ত্রোক্ত বচনটির সহিত আধুনিক পণ্ডিত ও সেকেলে মূর্খের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ না থাকিলেও, মণিশঙ্কর যে নিজের মনের ভাবটা প্রকাশ করিয়াছিলেন, চন্দ্রনাথ তাহা বুঝিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, খুড়ার সহিত আর সে কোন সম্বন্ধ রাখিবে না। আর পিতার জীবদ্দশাতেও এই দুই সহোদরের মধ্যে হৃদ্যতা ছিল না। কিন্তু আহার-ব্যবহারটা ছিল। এখন সেইটা বন্ধ হইল। চন্দ্রনাথের পিতা যথেষ্ট ধন-সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বাটীতে আত্মীয়-স্বজন কেহ নাই, শুধু এক অপুত্রক মাতুল এবং দ্বিতীয় পক্ষের মাতুলানী।

সমস্ত বাড়িটা যখন বড় ফাঁকা ঠেকিল, চন্দ্রনাথ তখন বাটীর গোমস্তাকে ডাকিয়া কহিল, সরকারমশায়, আমি কিছু দিনের জন্যে বিদেশে যাব, আপনি বিষয়-সম্পত্তি যেমন দেখছিলেন, তেমনি দেখবেন। আমার ফিরে আসতে বোধ করি বিলম্ব হবে।

মাতুল ব্রজকিশোর তাহাতে আপত্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, এ সময় তোমার কোথাও গিয়ে কাজ নেই; তোমার মন খারাপ হয়ে আছে, এ সময় বাড়িতে থাকাই উচিত।

চন্দ্রনাথ তাহা শুনিল না। বিষয়-সম্পত্তির সমুদয় ভার সরকার মহাশয়ের উপর দিয়া, এবং বসত বাটীর ভার ব্রজকিশোরের উপর দিয়া অতি সামান্যভাবেই সে বিদেশ-যাত্রা করিল। যাইবার সময় একজন ভৃত্যকেও সঙ্গে লইল না।

ব্রজকিশোরকে নিভৃতে ডাকিয়া তাঁহার স্ত্রী হরকালী বলিল, একটা কাজ করলে না?

ব্রজকিশোর জিজ্ঞাসা করিল, কি কাজ?

এই যে বিদেশে গেল, একটা-কিছু লিখে নিলে না কেন? মানুষের কখন্ কি হয় কিছুই বলা যায় না। যদি বিদেশে ভাল-মন্দ হঠাৎ কিছু হয়ে যায়, তখন তুমি দাঁড়াবে কোথায়?

ব্রজকিশোর কানে আঙ্গুল দিয়া জিভ কাটিয়া কহিলেন, ছি ছি, এমন কথা মুখে এনো না।

হরকালী রাগ করিল। কহিল, তুমি বোকা, তাই মুখে আনতে হয়েছে, যদি সেয়ানা হ'তে তা হ'লে মুখে আনতে হ'ত না।

কিন্তু কথাটা যে ঠিক্ তাহা ব্রজকিশোর স্ত্রীর কৃপায় দুই-চারি দিনেই বুঝিতে পারিলেন। তখন পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

এক বৎসর চন্দ্রনাথ নানা স্থানে একা ভ্রমণ করিয়া বেড়াইল। তাহার পর গয়ায় আসিয়া স্বর্গীয় পিতৃদেবের সাম্বৎসরিক পিণ্ড দান করিল, কিন্তু তাহার বাটী ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা হইল না, মনে করিল, কিছু দিন কাশীতে অতিবাহিত করিয়া যাহা হয় করিবে। কাশীতে মুখোপাধ্যায় বংশের পাণ্ডা হরিদয়াল ঘোষাল। চন্দ্রনাথ এক দিন দ্বিপ্রহরে একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ হাতে লইয়া তাঁহার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কাশী চন্দ্রনাথের অপরিচিত নহে, ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার সে পিতার সহিত এখানে আসিয়াছিল। হরিদয়ালও তাহাকে বিলক্ষণ চিনিতেন। অকস্মাৎ তাহার এরূপ আগমনে তিনি কিছু বিস্মিত হইলেন। উপরের একটা ঘর চন্দ্রনাথের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল, এবং ইহাও স্থির হইল যে, চন্দ্রনাথের যতদিন ইচ্ছা তিনি এখানেই থাকিবেন।

এ কক্ষের একটা জানালা দিয়া ভিতরে রন্ধনশালার কিয়দংশ

দেখা যাইত। চন্দ্রনাথ আগ্রহের সহিত অনেক সময় এইদিকে চাহিয়া থাকিত। রন্ধন সামগ্রীর উপরেই যে আগ্রহ তাহা নহে, তবে রন্ধনকারিণীকে দেখিতে বড় ভাল লাগিত।

বিধবা সুন্দরী। কিন্তু মুখখানি যেন দুঃখের আগুনে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে! যৌবন আছে কি গিয়াছে সেও যেন আর চোখে পড়িতে চাহে না। তিনি আপন মনে আপনার কাজ করিয়া যান, নিকটে কেবল একটি দশমবর্ষীয়া বালিকা রন্ধনের যোগাড় করিয়া দিতে থাকে। চন্দ্রনাথ অতৃপ্তনয়নে তাহাই দেখে।

কিছুদিন তিনি চন্দ্রনাথের সম্মুখে বাহির হইলেন না। আহার্য্য সামগ্রী ধরিয়া দিয়া সরিয়া যাইতেন। কিন্তু ক্রমশঃ বাহির হইতে লাগিলেন। একে ত চন্দ্রনাথ বয়সে ছোট, তাহাতে এক স্থানে অধিক দিন ধরিয়া থাকিলে একটা আত্মীয় ভাব আসিয়া পড়ে। তখন তিনি চন্দ্রনাথকে খাওয়াইতে বসিতেন—জননীর মত কাছে বসিয়া যত্নপূর্ব্বক আহার করাইতেন।

আপনার জননীর কথা চন্দ্রনাথের স্মরণ হয় না, চিরদিন মাতৃহীন চন্দ্রনাথ পিতার নিকট লালিত পালিত হইয়াছিল। পিতা সে স্থান কতক পূর্ণ রাখিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু এরূপ কোমল স্নেহ তথায় ছিল না।

পিতার মৃত্যুতে চন্দ্রনাথের বুকের যে অংশটা খালি পড়িয়াছিল শুধু যে তাহাই পূর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল তাহা নহে, অভিনব মাতৃ-স্নেহ-রসে তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিতে লাগিল।

একদিন চন্দ্রনাথ হরিদয়ালকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার নিজের বলিতে কেহ ত নাই বলিয়াই জানি, কিন্তু ইনি কে?

হরিদয়াল কহিল, ইনি বামুনঠাকরুণ।

কোন আত্মীয় ?

না।

তবে এঁদের কোথায় পেলেন

হরিদয়াল কহিলেন, সে অনেক কথা! তবে সংক্ষেপে বলতে হলে ইনি প্রায় তিন বৎসর হল স্বামী এবং ওই মেয়েটিকে নিয়ে তীর্থ করতে আসেন। কাশীতে স্বামীর মৃত্যু হয়। দেশেও এমন কোন আত্মীয় নেই যে ফিরে যান। তার পর ত দেখছ।

আপনি পেলেন কিরূপে ?

মণিকর্ণিকার ঘাটের কাছে মেয়েটি ভিক্ষে করছিল।

চন্দ্রনাথ একটু চিন্তা করিয়া কহিল, কোথায় বাড়ি জানেন কি ?

ঠিক্ জানি না। নবদ্বীপের নিকট কোন একটা গ্রামে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দিন-দুই পরে আহারে বসিয়া চন্দ্রনাথ বামুনঠাকরুণের মুখের পানে চাহিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা কোন্ শ্রেণী ?

বামুনঠাকরুণের মুখখানি বিবর্ণ হইয়া গেল। এ প্রশ্নের হেতু তিনি বুঝিলেন। কিন্তু যেন শুনিতে পান নাই এই ভাবে তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া বলিলেন, যাই দুধ আনি গে।

দুধের জন্য অত তাড়াতাড়ি ছিল না। ভাবিবার জন্য তিনি

একেবারে রন্ধনশালায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে কন্যা সরযূবালা হাতা করিয়া দুধ ঢালিতেছিল, জননীর বিবর্ণ মুখ লক্ষ্য করিল না। জননী কন্যার মুখপানে একবার চাহিলেন, দুধের বাটী হাতে লইয়া একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিলেন, হে দীন দুঃখীর প্রতিপালক, হে অন্তর্যামী, তুমি আমাকে মার্জনা করো। তাহার পর দুধের বাটী আনিয়া নিকটে রাখিয়া উপবেশন করিলে চন্দ্রনাথ পুনরায় সেই প্রশ্ন করিল।

একটি একটি করিয়া সমস্ত কথা জানিয়া লইয়া চন্দ্রনাথ অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি বাড়ি যান না কেন? সেখানে কি কেউ নেই?

খেতে দেয় এমন কেউ নেই।

চন্দ্রনাথ মুখ নিচু করিয়া কিছুক্ষণ ভাবিয়া কহিল, আপনার একটি কন্যা আছে, তার বিবাহ কিরূপে দেবেন?

বামুনঠাকরুণ দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, বিশ্বেশ্বর জানেন।

আহার প্রায় শেষ হইয়া আসিল। চন্দ্রনাথ মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল, ভাল ক'রে আপনার মেয়েটিকে কখন দেখি নি—হরিদয়াল বলেন, খুব শান্ত শিষ্ট। দেখ্‌তে সুশ্রী কি?

বামুনঠাকরুণ ঈষৎ হাসিয়া প্রকাশ্যে কহিলেন, আমি মা, মায়ের চক্ষুকে ত বিশ্বাস নেই বাবা; তবে সরযূ বোধ হয় কুৎসিত নয়। কিন্তু মনে মনে বলিলেন, কাশীতে কত লোক আসে যায়, কিন্তু এত রূপ ত কারও দেখি নি।

ইহার তিন-চারি দিন পরে, একদিন প্রভাতে চন্দ্রনাথ বেশ করিয়া সরযূকে দেখিয়া লইল। মনে হইল এত রূপ আর জগতে নাই। রান্নাঘরে বসিয়া সরযূ তরকারী কুটিতেছিল। সেখানে অপর কেহ ছিল না। জননী গঙ্গা-স্নানে গিয়াছিলেন, এবং হরিদয়াল যথানিয়মে যাত্রীর অন্বেষণে বাহির হইয়াছিলেন।

চন্দ্রনাথ নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। ডাকিল, সরযূ!

সরযূ চমকিত হইল। জড়সড় হইয়া বলিল, আজ্ঞে।

তুমি রাঁধতে পারো?

সরযূ মাথা নাড়িয়া কহিল, পারি।

কি কি রাঁধতে শিখেছ?

সরযূ চুপ করিয়া রহিল, কেন না পরিচয় দিতে হইলে অনেক কথা কহিতে হয়।

চন্দ্রনাথ মনের ভাবটা বুঝিতে পারিল, তাই অন্য প্রশ্ন করিল, তোমার মা ও তুমি দুজনেই এখানে কাজ কর?

সরযূ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, করি।

তুমি কত মাইনে পাও?

মা পান, আমি পাই নে। আমি শুধু খেতে পাই।

খেতে পেলেই তুমি কাজ কর?

সরযূ চুপ করিয়া রহিল।

চন্দ্রনাথ কহিল, মনে কর, আমি যদি খেতে দিই তা হলে আমারও কাজ কর?

সরযূ ধীরে ধীরে বলিল, মাকে জিজ্ঞাসা করব।

তাই ক'রো।

সেই দিন চন্দ্রনাথ হরিদয়াল ঠাকুরকে দুই-একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বাটীতে সরকার মহাশয়কে এইরূপ পত্র লিখিল—

আমি কাশীতে আছি। এখানে এই মাসের মধ্যেই বিবাহ করিব স্থির করিয়াছি। মাতুল মহাশয়কে এ কথা বলিবেন এবং আপনি কিছু অর্থ অলঙ্কার এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া শীঘ্র আসিবেন।

সেই মাসেই চন্দ্রনাথ সরযূকে বিবাহ করিল।

তাহার পর বাটী যাইবার সময় আসিল। সরযূ কাঁদিয়া বলিল, মা'র কি হবে?

আমাদের সঙ্গে যাবেন।

কথাটা বামুনঠাকরুণের কানে গেল। তিনি কন্যা সরযূকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন, সরযূ, সেখানে গিয়ে তুই আমার কথা মাঝে মাঝে মনে করিস্ কিন্তু আমার নাম কখনো মুখে আনিস্ না। যত দিন বাঁচব কাশী ছেড়ে কোথাও যাব না। তবে যদি কখনো তোদের এ অঞ্চলে আসা হয়, তা হ'লে আবার দেখা হতে পারে।

সরযূ কাঁদিতে লাগিল।

জননী তাহার মুখে অঞ্চল দিয়া কান্না নিবারণ করিলেন, এবং গম্ভীর হইয়া কহিলেন, বাছা, সব জেনে শুনে কি কাঁদতে আছে?

কন্যা জননীর কোলের ভিতর মুখ লুকাইয়া ডাকিল, মা—

তা হোক্। মায়ের জন্য যদি মাকে ভুলতে হয়, সেই ত মাতৃভক্তি মা।

চন্দ্রনাথ অনুরোধ করিলেও তিনি ইহাই বলিলেন। কাশী ছাড়িয়া তিনি আর কোথাও যাইতে পারিবেন না।
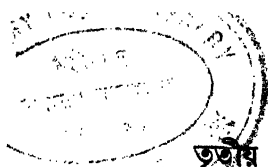
চন্দ্রনাথ স্থির করিয়া শুনি অবিশ্রাম বহিতে লাগিল কিন্তু
তবে অন্ততঃ স্বাধীনভাবে কা না। অতি বড় দুর্ভাগারা, যেমন
বামুনঠাকুরুণ তাহাও ছুঁয়া পায় না, সরযূর ভিতরেও সে
ঠাকুর আমাকে মেয়ের মত হইল না। কিন্তু আজ অকস্মাৎ
আশ্রয় দিয়েছিলেন, আমি দেখিতে পাইল, পদ্মের মত ডাগর
তাঁকে কিছুতেই ত্যাগ করতে প উঠিয়াছে, তখন কাতর হইয়া
চন্দ্রনাথ বুঝিল, দুঃখিনীর আশ্রয় লইল। বুকের উপর মুখ
তিনি কাহারও দয়ার পাত্রী হইবেন না। কথায় আর কাজ
সরযূকে লইয়া চন্দ্রনাথ বাটী ফিরিয়া আসিল। মুদিত চক্ষের
এখানে আসিয়া সরযূ দেখিল, প্রকাণ্ড বাড়ি!
কত আসবাব—তাহার আর বিস্ময়ের অবধি রহিল
মনে ভাবিল, কি অনুগ্রহ! কত দয়া! রকে জড়াইয়া
চন্দ্রনাথ বালিকা বধূকে আদর করিয়া কহিল
দেখলে? মনে ধরেছে ত? তোমার বড়
সরযূ অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া আঁচলে মুখ লুকাইয়া মা হ'ত, না
চন্দ্রনাথ স্ত্রীর মনের কথা বুঝিতে চাহে নাই, প্রত্যুত্তরে চেয়ে
শুনিতে চাহিয়াছিল, তাই দুই হাতে সরযূর মুখখানি তুলিয়া আছ,
কহিল, কি বল, মনে ধরেছে ত? হয় সরযূ
লজ্জায় সরযূর মুখ আরক্ত হইয়া গেল, কিন্তু স্বামীর
প্রশ্নে কোনরূপে সে বলিয়া ফেলিল, সব তোমার? চরণে
চন্দ্রনাথ হাসিয়া কথাটা একটু ফিরাইয়া বলিল, রহিল
তোমার।

তাই ক'রো।

সেই দিন চন্দ্রনাথ হরিদয়াল হইয়া গেল। সরযূ বড়
জিজ্ঞাসা করিয়া বাটীতে সরকার মহাশতে শিখিয়াছে। চন্দ্রনাথ
আমি কাশীতে আছি। এখানে এর পূর্ব্বেই সরযূ তাহার মনের
স্থির করিয়াছি। মাতুল মহাশয়কে দাসী হইত, তাহা হইলে
কিছু অর্থ অলঙ্কার এবং প্রয়োজনীয় আর একটী দাসী পাইত না,
সেই মাসেই চন্দ্রনাথ সরয গ্রহ করে না—স্ত্রীর নিকট আরও
তাহার পর বাটী। মনে হয়, দাসীর আচরণের সহিত স্ত্রীর
মা'র কি হবে? ভাবে মিলিয়া না গেলেই ভাল হয়। সরযূর
আমাদের স্নেহ, বড় মধুর, কিন্তু দাম্পত্যের সুনিবিড় পরিপূর্ণ
কথাটা বাঁধন গড়িয়া তুলিতে পারিল না। তাই এমন মিলনে,
নিভৃতে ডাকিয়া উভয়ের মধ্যে একটা দূরত্ব, একটা অন্তরাল কিছুতেই
মাঝে মাঝে মনে। একদিন সে সরযূকে হঠাৎ বলিল, তুমি এত
যত দিন বাঁচব কেন? আমি কি কোন দুর্ব্যবহার করি?
তোদের এ মনে মনে বলিল, এ কথার উত্তর কি তুমি নিজে জানো
সরযূ তার পর ভাবিল, তুমি দেবতা, কত উচ্চ, কত মহান—
জননী মি? সে তুমি আজও জানো না। তুমি আমার প্রতি-
গম্ভীর হইয়া আমি শুধু তোমার আশ্রিতা। তুমি দাতা, আমি
কন্যা।

তা তার সমস্ত হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ, তাই ভালবাসা মাথা
চন্দ্র উপরে উঠিতে পারে না—অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত নিঃশব্দে
ছাড়ি ধীরে হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে লুকাইয়া বহিতে থাকে,
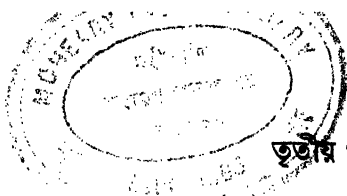
উচ্ছৃঙ্খল হইতে পায় না—তেমনি অবিশ্রাম বহিতে লাগিল কিন্তু চন্দ্রনাথ তাহার সন্ধান পাইল না। অতি বড় দুর্ভাগারা যেমন জীবনের মাঝে ভগবানকে খুঁজিয়া পায় না, সরযূর ভিতরেও সে তেমনি ভালবাসা দেখিতে পাইল না। কিন্তু আজ অকস্মাৎ উজ্জ্বল দীপালোকে যখন সে দেখিতে পাইল, পদ্মের মত ডাগর সরযূর চক্ষু দুটিতে অশ্রু ছাপাইয়া উঠিয়াছে, তখন কাতর হইয়া সহসা তাহাকে সে কাছে টানিয়া লইল। বুকের উপর মুখ লুটাইয়া পড়িল। চন্দ্রনাথ কহিল, থাক্, ওসব কথায় আর কাজ নেই। বলিয়া দুই হাতে স্ত্রীর মুখ তুলিয়া ধরিল, মুদিত চক্ষের উপর সরযূ একটা তপ্ত নিশ্বাস অনুভব করিল।

চন্দ্রনাথ কহিল, একবার চেয়ে দেখ দেখি—

সরযূর চোখের পাতা দুইটি আকুলভাবে পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিল, সে কিছুতে চাহিতে পারিল না।

কিছুক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চন্দ্রনাথ কহিল, তোমার বড় ভয়, তাই চাইতে পার্‌লে না সরযূ, কিন্তু পার্‌লে ভাল হ'ত, না হয়, একটা কাজ ক'রো, আমার ঘুমন্ত মুখ ভাল ক'রে চেয়ে দেখো—এ মুখে ভয় কর্‌বার মতো কিছু নেই। বুকে শুয়ে আছ, ভিতরের কথাটা কি শুনতে পাও না? তাই বড় দুঃখ হয় সরযূ, আমাকে তুমি বুঝ্‌তেই পার্‌লে না।

তবু সরযূ কথা কহিতে পারিল না, শুধু মনে মনে স্বামীর চরণে প্রণাম করিয়া কহিল, আমি পদাশ্রিতা দাসী, দাসীকে চিরদিন দাসীর মতই থাকতে দিয়ো।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চন্দ্রনাথের মাতুলানী হরকালীর মনে আর তিলমাত্র সুখ রহিল না। ভগবান তাহাকে এ কি বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। এ সংসারটা কাহারো নিকট কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যের মত বোধ হয়, তাহাদের চেষ্টা করিয়া এখানে একটা পথের সন্ধান করিতে হয়। কেহ পথ পায়, কেহ পায় না। অনেক দিন হইতে হরকালীও এই সংসার-কাননে একটা সংক্ষেপে পথ খুঁজিতেছিল, চন্দ্রনাথের পিতার মৃত্যুতে একটা সুরাহাও হইয়াছিল। কিন্তু এই আকস্মিক বিবাহ, বধূ সরযূ, চন্দ্রনাথের অতিরিক্ত পত্নী-প্রেম, তাহার এই পাওয়া পথের মুখটা একেবারে পাষাণ দিয়া যেন গাঁথিয়া দিল। হরকালীর একটি বছর-পাঁচেকের বোনঝি পিতৃগৃহে বড় হইয়া আজ দশ বছরেরটি হইয়াছে। কিন্তু সে কথা যাক্। নানা কারণে হরকালীর মনের সুখ-শান্তি অন্তর্হিত হইবার উপক্রম করিয়াছিল।

অবশ্য আজও সেই গৃহিণী, তাহার স্বামী কর্ত্তা—এ সমস্ত তেমনই আছে? আজ পর্য্যন্ত সরযূ তাহারই মুখ চাহিয়া থাকে, কোন অসন্তোষ বা অভিমান প্রকাশ করে না। দেখিলে মনে হয়, সে এই পরিবারভুক্ত একটি সামান্য পরিজন মাত্র। হরকালীর স্বামী এইটুকু দেখিয়াই খুসি হইয়া যাই বলিতে যায়—বৌমা আমার যেন—হরকালী চোখ রাঙা করিয়া ধমক দিয়া বলিয়া উঠে, চুপ কর, চুপ কর। যা বোঝ না, তাতে কথা

কয়ো না। তোমার হাতে দেওয়ার চেয়ে বাপ-মা আমাকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিলে ছিল ভাল।

ব্রজকিশোর মুখ কালি করিয়া উঠিয়া যায়।

হরকালীর বয়স প্রায় ত্রিশ হইতে চলিল, কিন্তু সরযূর আজও পঞ্চদশ উত্তীর্ণ হয় নাই—তবু তাহার আসা অবধি দুই জনের মনে মনে যুদ্ধ বাধিয়াছে। প্রাণপণ করিয়াও হরকালী জয়ী হইতে পারে না। এক ফোঁটা মেয়ের শক্তি দেখিয়া হরকালী মনে মনে অবাক্ হয়। বাহিরের লোক এ কথা জানে না যে, এই অন্তর-যুদ্ধে সরযূ ডিক্রি পাইয়াছে, কিন্তু তাহা জারি করে নাই। নিজের ডিক্রি নিজে তামাদি করিয়া বিজিত অংশ তাহাকেই সে ফিরাইয়া দিয়াছে এবং এইখানেই হরকালীর একেবারে হার হইয়াছে।

হরকালী বুঝিতে পারে, সরযূ বোবা কিম্বা হাবা নহে। অনেকগুলি শক্ত কথাও সে এমন নিরুত্তর অবনতমুখে উত্তর দিতে সমর্থ যে, হরকালী একেবারে স্তম্ভিত হইয়া যায়, কিন্তু না পারিল সে এই মেয়েটির সহিত সন্ধি করিতে, না পারিল তাহাকে জয় করিতে; সরযূ যদি কলহ-প্রিয় মুখরা হইত, স্বার্থপর নির্দ্দয় হইত, তাহা হইলেও হরকালী হয় ত একটা পথ খুঁজিয়া পাইত। কিন্তু সরযূ নিজে হইতে এতখানি করুণা তাহাকে দিয়া রাখিয়াছে যে, হরকালী অপরের করুণা ভিক্ষা করিবার আর অবকাশ পায় না। সরযূ অন্তরে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারে যে, এ বাটীর সেই সর্ব্বময়ী কর্ত্রী, হরকালী কেহ না, তা[illegible]হিরে সে 'কেহ না' হইয়া হরকালীকেই সর্ব্বময়ী করিয়াছে। [illegible]ই হরকালী আরও ঈর্ষায় জ্বলিয়া

পুড়িয়া মরে। শুধু একটি স্থান সরযূ একেবারে নিজের জন্য রাখিয়াছিল, এখানে হরকালী কিছুতেই প্রবেশ করিতে পায় না। স্বামীর চতুষ্পার্শ্বে সে এমনি একটি সূক্ষ্ম দাগ টানিয়া রাখিয়াছে যে, তাহার ভিতরে প্রবেশ না করিতে পারিলে আর চন্দ্রনাথের শরীরে আঁচড়টিও কাটিতে পারে না। এই দাগের বাহিরে হরকালী যাহা ইচ্ছা করুক, কিন্তু ভিতরে আসিবার অধিকার ছিল না। বুদ্ধিমতী হরকালী বেশ বুঝিতে পারে যে এই এক ফোঁটা মেয়েটি কোন এক মায়া-মন্ত্রে তাহার সমস্ত বিষ হরণ করিয়া লইয়াছে।

এমনি করিয়া দীর্ঘ ছয় বৎসর গত হইল। সে এগারো বছর বয়সে স্বামীর ঘর করিতে আসিয়াছিল সতেরোয় পড়িল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বয়সের সম্মান-জ্ঞানটা যেমন পুরুষের মধ্যে আছে, স্ত্রীলোক-দিগের মধ্যে তেমন নাই। পুরুষের মধ্যে অনেকগুলি পর্য্যায় আছে—যেমন দশ, কুড়ি, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট প্রভৃতি। ত্রিশ বছরের একজন যুবা কুড়ি বছরের একজন যুবার প্রতি মুরুব্বিয়ানা চোখে চাহিয়া দেখিতে পারে, কিন্তু মেয়েমহলে এটা খাটে না। তাহারা বিবাহ-কালটা পর্য্যন্ত বড় ভগিনী, ভ্রাতৃজায়া, জননী, পিসিমা, অথবা ঠাকুরমার নিকট অল্পস্বল্প উমেদারী করে, নারী-জীবনে যাহা কিছু অল্প-বিস্তর শিখিবার আছে, শিখিয়া লয়; তাহার পরই একেবারে প্রথম শ্রেণীতে চড়িয়া

বসে। তখন ষোল হইতে ছাপান্ন পর্য্যন্ত তাহারা সমবয়সী। স্থানভেদে হয় ত বা কোথাও এ নিয়মের সামান্য ব্যতিক্রম দেখা যায়, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এমনি। অন্ততঃ চন্দ্রনাথের গ্রাম সম্পর্কীয়া ঠান্‌দিদি হরিবালার জীবনে এমনটি দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। সেদিন অপরাহ্ণে পশ্চিমদিকের জানালা খুলিয়া দিয়া সরযূ আকাশের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। হরিবালা একথালা মিষ্টান্ন একগাছি মোটা যূঁইয়ের মালা হাতে লইয়া একেবারে সরযূর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। মালাগাছটি তাহাকে পরাইয়া দিয়া বলিল, আজ থেকে তুমি আমার সই হ'লে। বল দেখি, সই—

সরযূ একটু বিপন্ন হইল। তথাপি অল্প হাসিয়া কহিল, বেশ।

বেশ ত নয় দিদি, সই ব'লে ডাকতে হবে।

ইহাকে আদরই বল, আর আবদারই বল, সরযূর জীবনে ঠিক এমনটি ইতিপূর্ব্বে ঘটিয়া উঠে নাই, তাই এই আকস্মিক আত্মীয়তাটাকে সে মনের মধ্যে মিলাইয়া লইতে পারিল না। একদণ্ডে একজন দিদিমার বয়সী লোকের গলা ধরিয়া 'সই' বলিয়া আহ্বান করিতে তাহার লজ্জা করিতে লাগিল, কিন্তু হরিবালা যে ছাড়ে না। ইহাতে অভিনবত্ব কিংবা অস্বাভাবিকতা যে কিছু থাকিতে পারে, হরিবালার তাহা ধারণা নাই। তাই সরযূর মুখ হইতে এই প্রিয় সম্বোধনটির বিলম্ব দেখিয়া একটু গম্ভীরভাবে, একটু ম্লান হইয়া সে কহিল, তবে আমার মালা ফিরিয়ে দাও, আমি আর কোথাও যাই।

সরযূ বিপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু অপ্রতিভ হয় নাই, ঈষৎ হাসিয়া মৃদুস্বরে কহিল, সইয়ের সন্ধানে না কি?

ঠান্‌দিদি একটুখানি স্থির থাকিয়া বলিল, বাঃ! এই যে বেশ কথা কও। তবে যে লোকে বলে, ওদের বৌ বোবা!

সরযূ হাসিতে লাগিল।

ঠান্‌দিদি বলিলেন, তা শোন। এ গাঁয়ে তোমার একটিও সাথী নাই। বড়লোকের বাড়ি বলেও বটে, আর তোমার মামির বচনের গুণেও বটে, কেউ তোমার কাছে আসে না জানি। আমি তাই আসব। আমার কিন্তু একটা সম্পর্ক না হ'লে চলে না, তাই আজ সই পাতালুম। আর বুড়ো হয়েছি, বটে, কিন্তু হরিনামের মালা নিয়েও সারাদিনটা কাটাতে পারি না। আমি রোজ আস্‌ব।

সরযূ কহিল, রোজ আসবেন।

হরিবালা গর্জ্জিয়া উঠিল, আস্‌বেন কি লা? বল্ সই, তুমি রোজ এস। 'তুই' বলতে পারবি নে, না?

সরযূ হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, রক্ষা কর ঠান্‌দিদি, গলায় ছুরি দিলেও তা পারব না।

ঠান্‌দিদিও হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, তা না হয় নাই বলিস্। কিন্তু 'তুমি' বল্‌তেই হবে। বল্—সই তুমি রোজ এস।

সরযূ চোখ নিচু করিয়া সলজ্জ হাস্যে বলিল, সই তুমি রোজ এস।

হরিবালার যেন একটা দুর্ভাবনা কাটিয়া গেল। সে কহিল, আস্‌ব।

পরদিন হইতে হরিবালা প্রায়ই আসেন, শত কর্ম্ম থাকিলেও একবার হাজির হইয়া যান। ক্রমশঃ পাতানো সম্বন্ধ গাঢ় হইয়া আসিল। সময়ে সরযূও ভুলিয়া গেল যে, হরিবালা তাহার সমবয়সী নহে, কিম্বা এই গলায় গলায় মেশামেশি সকলের কাছে তেমন সুন্দর দেখিতে হয় না।

এই অন্তরঙ্গতা হরকালীর কেমন লাগিত বলিতে পারি না, কিন্তু চন্দ্রনাথের বেশ লাগিত। স্ত্রীর সহিত এ বিষয়ে প্রায়ই তাহাও কথা-বার্ত্তা হইত। ঠান্‌দিদির এই হৃদ্যতায় তিনি আমোদবোধ করিতেন। আরও একটু কারণ ছিল। চন্দ্রনাথ স্ত্রীকে বড় স্নেহ করিতেন, সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া ভালবাসা না থাকিলেও স্নেহের অভাব ছিল না। তিনি মনে করিতেন, সকলের ভাগ্যেই একরূপ স্ত্রী মিলে না। কাহারো বা বন্ধু, কাহারো বা প্রভু! তাঁহার ভাগ্যে যদি একটি পুণ্যবতী, পবিত্র, সাধ্বী এবং স্নেহময়ী দাসী মিলিয়াছে ত তিনি অসুখী হইয়া কি লাভ করিবেন? তাহার উপর একটা কথা প্রায়ই তাঁহার মনে হয় সেটা সরযূর বিগত দিনের দুঃখের কাহিনী। শিশুকালটা তাহার বড় দুঃখেই অতিবাহিত হইয়াছে! দুঃখিনীর কন্যা হয় ত সারা জীবনটা দুঃখেই কাটাইত; হয় ত বা এতদিনে কোন দুর্ভাগ্য দুশ্চরিত্রের হাতে পড়িয়া চক্ষের জলে ভাসিত, না হয় দাসীবৃত্তি করিতে গিয়া শত অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করিত; তা ছাড়া এত অধিক রূপ-যৌবন লইয়া নরকের পথও দুরূহ নহে; তাহা হইলে?

এই কথাটা মনে উঠিলেই চন্দ্রনাথ গভীর করুণায় সরযূর লজ্জিত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, আচ্ছা সরযূ,

আমি যদি তোমাকে না দেখতুম, যদি বিয়ে না করতুম, এতদিন তুমি কার কাছে থাক্‌তে, বল ত?

সরযূ জবাব দিত না; সভয়ে স্বামীর বুকের কাছে সরিয়া আসিত। চন্দ্রনাথ সস্নেহে তাহার মাথার উপর হাত রাখিতেন। যেন সাহস দিয়া মনে মনে বলিতেন, ভয় কি!

সরযূ আরও কাছে সরিয়া আসিত—এ সব কথায় সত্যই সে বড় ভয় পাইত। চন্দ্রনাথ তাহা বুঝিতে পারিয়াই যেন তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিতেন, তা নয় সরযূ, তা নয়। তুমি দুঃখীর ঘরে গিয়ে কেন জন্মেছিলে, জানি নে; কিন্তু তুমিই আমার জন্ম-জন্মান্তরের পতিব্রতা স্ত্রী! তুমি সংসারের যে-কোনো জায়গায় ব'সে টান দিলে আমায় যেতে হ'ত। তোমার আকর্ষণেই যে আমি কাশী গিয়েছিলুম সরযূ!

এই সময় তাহার হৃদয়ের ভিতর দিয়া যে ভাবের স্রোত বহিয়া যাইত, সরযূর সমস্ত স্নেহ, প্রেম, যত্ন, ভক্তি এক করিলেও বোধ করি তাহার তুলনা হইত না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দুঃখীকে দয়া করিয়া যে গর্ব্ব, যে তৃপ্তি বালিকা সরযূকে বিবাহ করিবার সময় একদিন আত্ম-প্রসাদের ছদ্ম-বেশে চন্দ্রনাথের নিভৃত অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল, এখন শত চেষ্টাতেও চন্দ্রনাথ তাহার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিতে পারে না। হৃদয়ের অজ্ঞাত অন্ধকার কোণে আজও সে বাসা বাঁধিয়া আছে। তাই যখনই সেটা মাথা তুলিয়া উঠিতে চায়, তখনই চন্দ্রনাথ সরযূকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বার বার বলিতে থাকে, আমি বড় আশ্চর্য্য হই সরযূ, যাকে চিরদিন দেখে এসেচ, তাকে কেন

চিন্‌তে বিলম্ব হচ্চে! আমি ত তোমাকে কাশীতে দেখেই চিনেছিলুম, তুমি আমার! কত যুগ, কত কল্প, কত জন্ম ধ'রে আমার! কি জানি, কেন আলাদা হয়েছিলুম, আবার এক হয়ে মিলতে এসেচি।

সরযূ বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া মৃদুকণ্ঠে কহে, কে বল্‌লে, আমি তোমাকে চিন্‌তে পারি নি।

উৎসাহের আতিশয্যে চন্দ্রনাথ সরযূর লজ্জিত মুখখানি নিজের মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া বলেন, পেরেচ? তবে, কেন এত ভয়ে ভয়ে থাক? আমি ত কোন দুর্ব্যবহার করি নে—আমি যে আমার নিজের চেয়েও তোমাকে ভালবাসি সরযূ?

সরযূ আবার স্বামীর বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া ফেলে। চন্দ্রনাথ আবার প্রশ্ন করেন, বল, কেন ভয় পাও? সরযূ আর উত্তর দিতে পারে না। স্বামীকে স্পর্শ করিয়া সে মিথ্যা কথা কি করিয়া মুখে আনিবে? কি করিয়া বলিবে যে, ভয় করে না! সত্যই যে তাহার বড় ভয়! সে যে কত সত্য, কত বড় ভয়, তাহা সে ছাড়া আর কে জানে?

তা কথাটা কি বলিতেছিলাম। চন্দ্রনাথ হরিবালার আগমনে আমোদ বোধ করিতেন। সরযূ একটি সখী পাইয়াছে, দুটো মনের কথা বলিবার লোক জুটিয়াছে—ইহাই চন্দ্রনাথের আনন্দের কারণ।

একদিন সরযূ সমস্ত দুপুরটা হরিবালার প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল। আকাশে মেঘ করিয়া টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছিল; হরিবালা আসিল না। সরযূ মনে করিল, জল পড়িতেছে তাই আসিল না। এখন বেলা যায় যায়, সমস্ত দিনটা একা কাটিয়াছে,

হরকালীও আজ বাটী নাই। সরযূ তখন সাহসে ভর করিয়া ধীরে ধীরে স্বামীর পড়িবার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলে এ ঘরটিতে কেহ প্রবেশ করিত না। সরযূও না। চন্দ্রনাথ বই হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন, আজ বুঝি তোমার সই আসে নি?

না।

তাই বুঝি আমাকে মনে পড়েছে?

সরযূ ঈষৎ হাসিল। ভাবটা এই যে, মনে সর্ব্বদাই পড়ে, কিন্তু সাহসে কুলায় না। সরযূ বলিল, জলের জন্য বোধ হয় আসতে পারেন নি।

বোধ হয় তা নয়। আজ কাকার ছোটমেয়ে নির্ম্মলাকে আশীর্ব্বাদ করতে এসেছে। শিগ্রই বিয়ে হবে। তারই আয়োজনে ঠান্‌দিদি বোধ হয় মেতেছেন।

সরযূ বলিল, বোধ হয়।

তাহার পর চন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, দুঃখ হয় যে, আমরা একেবারে পর হয়ে গেছি—মামিমা কোথায়?

তিনিও বোধ হয় সেইখানে।

চন্দ্রনাথ চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

সরযূ ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া একপাশে বসিয়া পড়িয়া বলিল, কি ভাবচ, বল না।

চন্দ্রনাথ একবার হাসিবার চেষ্টা করিয়া সরযূর হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, বিশেষ-

কিছু নয় সরযূ! ভাবছিলেম, নির্ম্মলার বিয়ে, কাকা কিন্তু আমাকে একবার খবরটাও দিলেন না, অথচ মামিমাকেও ডেকে নিয়ে গেলেন। আমরা দুজনেই শুধু পর!

তাঁহার স্বরে একটু কাতরতা ছিল, সরযূ তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল, আমাকে পায়ে স্থান দিয়েই তুমি আরও পর হয়ে গেছ; না হ'লে বোধ হয় এত দিনে মিল হ'তে পার্‌ত।

চন্দ্রনাথ হাসিলেন, কহিলেন; মিল হয়ে কাজ নেই। তোমার পরিবর্ত্তে, কাকার সঙ্গে মিল ক'রে যে আমার মস্ত সুখ হ'ত, সে ত মনে হয় না। আমি বেশ আছি। যখন বিয়ে করেছিলুম, তখন যদি কাকার মত নিতে হ'ত, তা হ'লে এমন ত বোধ হয় না যে, তোমাকে কখনো পেতুম, একটা বাধা নিশ্চয় উঠ্‌ত। হয় কুল নিয়ে, না হয় বংশ নিয়ে—যেমন করেই হোক বিয়ে ভেঙ্গে যেত।

ভিতরে ভিতরে সরযূ শিহরিয়া উঠিল। তখন সন্ধ্যার ছায়া ঘরের মধ্যে অন্ধকার করিয়াছিল, তাই তাহার মুখখানি দেখিতে পাওয়া গেল না, কিন্তু যে হাতখানি তাহার হাতের মধ্যে ধরা ছিল, সেই হাতখানি কাঁপিয়া উঠিয়া সরযূর সমস্ত মনের কথা চন্দ্রনাথের কাছে প্রকাশ করিয়া দিল। চন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, এখন বুঝ্‌তে পেরেছ, মত না নিয়ে ভাল করেচি কি মন্দ করেচি।

সরযূ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কি জানি! কিন্তু আমার মত শত সহস্র দাসীরও ত তোমার অভাব হ'ত না।

চন্দ্রনাথ সরযূর কোমল হাতখানি সস্নেহে ঈষৎ পীড়ন করিয়া

বলিলেন, তা জানি নে। আমার দাসী একটি, তার অভাবের কথাই ভাবতে পারি। শত সহস্রের ভাবনা ইচ্ছে হয় তুমি ভেবো।

পরদিন হরিবালা আসিল; কিন্তু মুখের ভাবটা কিছু স্বতন্ত্র। ফস্ করিয়া গলা ধরিয়া সই সই বলিয়া সে ব্যস্ত করিল না, কিংবা বিন্তি খেলিবার জন্ম তাস আনিতেও পুনঃ পুনঃ সাধাসাধি পীড়াপীড়ি করিল না। মলিনমুখে মৌন হইয়া রহিল।

সরযূ বলিল, সইয়ের কাল দেখা পাই নি।

হাঁ দিদি—কাল বড় কাজ ছিল। ও বাড়িতে নির্ম্মলার বিয়ে।

তা শুনেছি। সব ঠিক্ হ'ল কি?

হরিবালা সে কথার উত্তর না দিয়া সরযূর মুখের পানে চাহিয়া বলিল, সই, একটা কথা—সত্যি বল্‌বি?

কি কথা?

যদি সত্যি বলিস্, তা হ'লেই জিজ্ঞাসা করি— না হ'লে জিজ্ঞাসা ক'রে কোন লাভ নেই।

সরযূ চিন্তিত হইল। বলিল, সত্যি বলব না কেন?

দেখিস্ দিদি—আমাকে বিশ্বাস করিস্ ত?

করি বৈ কি!

তবে বল দেখি, চন্দ্রনাথ তোকে কতখানি ভালবাসে?

সরযূ একটু লজ্জিত হইল, বলিল, খুব দয়া করেন।

দয়ার কথা নয়। খুব একেবারে বড় বেশি ভালবাসে কি না?

সরযূ হাসিল। বলিল, বড় বেশি কি না—কেমন ক'রে জান্‌ব?

সত্যি জানিস্ না?

না।

সত্যই সরযূ ইহা জানিত না। হরিবালা যেন বড় বিমর্ষ হইয়া পড়িল। মাথা নাড়িয়া বলিল, স্ত্রী জানে না, স্বামী তাকে কতখানি ভালবাসে। এইখানেই আমার বড় ভয়।

হরিবালার মুখের ভাবে একটা গভীর শঙ্কা প্রচ্ছন্ন ছিল, সরযূ তাহা বুঝিয়া নিজেও শঙ্কিত হইল। বলিল, ভয় কিসের?

আর একদিন শুনিস্। তার পর চিবুকে হাত দিয়া মৃদুস্বরে কহিল, এত রূপ, এত গুণ, এত বুদ্ধি নিয়ে সই এত দিন কি ঘাস কাট্‌ছিলি?

সরযূ হাসিয়া ফেলিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তখনও কথাটা প্রকাশ পায় নাই। হরিদয়াল ঘোষালের সন্দেহের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন ছিল। একজন ভদ্রলোকের মত দেখিতে অথচ বস্ত্রাদি জীর্ণ এবং ছিন্ন আজ দুই-তিন দিন হইতে বামুন-ঠাকরুণ সুলোচনা দেবীর সহিত গোপনে পরামর্শ করিয়া যাইতে-ছিল। সুলোচনা ভাবিত হরিদয়াল তাহা জানেন না, কিন্তু তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন।

আজ দ্বিপ্রহরে দয়াল ঠাকুর এবং কৈলাস খুড়া ঘরে বসিয়া দাবা খেলিতেছিলেন। এমন সময় অন্দরের প্রাঙ্গণে একটা

গোলযোগ উঠিল। কে যেন মৃদুকণ্ঠে সকাতরে দয়া ভিক্ষা চাহিতেছে, এবং অপরে কর্কশকণ্ঠে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করিতেছে এবং ভয় দেখাইতেছে। একজন স্ত্রীলোক, অপর পুরুষ। দয়াল ঠাকুর কহিলেন, খুড়ো, বাড়িতে কিসের গোলমাল হয়?

কৈলাস খুড়া বলিলেন, কিস্তি। সামলাও দেখি বাবাজী!

আবার অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটিল। ভিতরের গোলমাল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া দয়াল ঠাকুর উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

খুড়ো, একটু ব'সো আমি দেখে আসি!

খুড়া তাঁহার কোঁচার টিপ এক হাতে ধরিয়া কহিলেন, এবার যে বাবা চাপা গেল।

দয়াল ঠাকুর পুনর্ব্বার বসিয়া পড়িলেন। কিন্তু গোলমাল কিছুতেই থামে না! তখন দয়াল ঠাকুর অগত্যা উঠিয়া পড়িলেন। প্রাঙ্গণে আসিয়া দেখিলেন, সুলোচনা দুই হাতে সেই লোকটার পা জড়াইয়া আছে এবং সে উত্তরোত্তর চাপা-কণ্ঠে কহিতেছে, আমার কথা রাখ, না হ'লে যা বল্‌ছি, তাই করব।

সুলোচনা কাঁদিয়া বলিতেছে, আমায় মার্জ্জনা কর। তুমি একবার সর্ব্বনাশ করেছ, যা-একটু বাকি আছে, সেটুকু আর নাশ ক'রো না।

সে কহিতেছে, তোমার মেয়ে বড়লোকের ঘরে পড়েছে, দুহাজার টাকা দিতে পারে না? আমি টাকা পেলেই চ'লে যাব।

সুলোচনা কহিল, তুমি মাতাল অসচ্চরিত্র! দুহাজার টাকা

তোমার কত দিন ? তুমি আবার আস্‌বে, আবার টাকা চাইবে—আমি কিছুতেই তোমায় টাকা দেব না।

আমি মদ ছেড়ে দেব। ব্যবসা কর্‌ব ; আর কখনও তোমার কাছে টাকা চাইতে আস্‌ব না।

সুলোচনা সে কথার উত্তর না দিয়া ভূমিতলে মাথা খুঁড়িয়া যুক্ত-করে কহিল, দয়া কর—টাকার জন্য আমি সরযুকে অনুরোধ করতে পার্‌ব না।

দয়াল ঠাকুর যে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহা কেহই দেখে নাই, তাই এ-সব কথা জোরে জোরেই হইতেছিল। দয়াল ঠাকুর এইবার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সহসা দুজনেই চমকিত হইল—দয়াল ঠাকুর এই অপরিচিত লোকটার নিকটে আসিয়া কহিলেন, তুমি কার অনুমতিতে বাড়ির ভেতর ঢুকেছ ?

লোকটা প্রথমে থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর যখন বুঝিল কাজটা তেমন আইন-সঙ্গত হয় নাই, তখন সরিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। কঠিন মুষ্টিতে হরিদয়াল তাহার হাত ধরিয়া উচ্চ-কণ্ঠে পুনর্ব্বার কহিলেন, কার অনুমতিতে ?

পলাইবার উপায় নাই দেখিয়া সে সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল, সুলোচনার কাছে এসেছি!

তাহার মুখ দিয়া তীব্র সুরার গন্ধ বাহির হইতেছে, এবং সর্ব্বাঙ্গে হীনতা এবং অত্যাচারের মলিন ছায়া পড়িয়াছে। দয়াল ঠাকুর ঘৃণায় ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া সেইরূপ কর্কশ ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কার হুকুমে ?

হুকুম আবার কি?

লোকটার মুখের ভাব পরিবর্তিত হইল; সহসা যেন তাহার স্মরণ হইল, প্রশ্ন-কর্তার উপর তাহার জোর আছে এবং এ বাড়ির উপরেও কিঞ্চিৎ দাবি আছে। দয়াল ঠাকুর এরূপ উত্তরে অসম্ভব চটিয়া উঠিলেন, উচ্চ-স্বরে কহিলেন, ব্যাটা মাতাল, জান, তোমাকে এখনি জেলে দিতে পারি!

সে বিদ্রূপ করিয়া কহিল, জানি বৈ কি!

দয়াল ঠাকুর প্রায় প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন—জান বৈ কি! চল্ ব্যাটা, এখনি তোকে পুলিসে দেব।

লোকটা ঈষৎ হাসিয়া এরূপ ভাব প্রকাশ করিল, যেন পুলিসের নিকট যাইতে তাহার বিশেষ আপত্তি নাই। কহিল, এখুনি দেবে?

দয়াল ঠাকুর ধাক্কা দিয়া বলিলেন, এখুনি।

লোকটা ধাক্কা সাম্‌লাইয়া স্থির হইয়া গম্ভীরভাবে বলিল, ঠাকুর, একেবারে অত বিক্রম প্রকাশ ক'রো না। পুলিসে দেবে কি থানায় দেবে, একটু বিলম্ব ক'রে দিয়ো। আমি তোমাকে কাশী ছাড়া করতে পারি জান?

দয়াল ঠাকুর উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ব্যাটা পাজি, ... আমার চল্লিশ বছর কাশীবাস হ'ল, এখন তুমি কাশীছাড়া করবে?

তিনি ভাবিয়াছিলেন লোকটা তাঁহাকে গুণ্ডার ভয় দেখাইতেছে। অনেকে এ কথায় হয় ত ভয় পাইত, কিন্তু এই দীর্ঘকালের কাশীবাসে দয়াল ঠাকুরের এ ভয় ছিল না। বলিলেন, ব্যাটা, আমার কাছে গুণ্ডাগিরি!

গুণ্ডাগিরি নয় ঠাকুর, গুণ্ডাগিরি নয়। পুলিসে নিয়ে চল। সেখানেই সব কথা প্রকাশ কর্‌ব।

কোন্ কথা প্রকাশ কর্‌বে?

যা জানি। যাতে তুমি কাশী ছেড়ে পালাতে পথ পাবে না। যাতে সমস্ত দেশের লোক শুন্‌বে যে, তুমি জাতিচ্যুত অব্রাহ্মণ।

আমি অব্রাহ্মণ!

রাগ ক'রো না ঠাকুর। তুমি জাতিচ্যুত। শুধু তাই নয়। তোমার কাছে যত ভদ্রসন্তান বিশ্বাস ক'রে এসেছে, এই তিন বৎসরের মধ্যে যত লোককে তুমি অন্ন বেচেছ, সকলেরই জাত গেছে। সকলকেই আমি সে কথা বল্‌বো।

দয়াল ঠাকুর ভয় পাইলেন। ভয়ের যথার্থ কারণ [illegible] হইবার পুর্ব্বেই উদ্ধত কণ্ঠস্বর নরম হইয়া আসিল। তথাপি [illegible] আমি লোকের জাত মেরেছি?

তাই। আর প্রমাণ করবার ভারও আমার।

ঠাকুর নরম হইয়া কণ্ঠস্বর কিছু কম করিয়া বলিলেন, কথাটা কি, ভেঙ্গে বল দেখি বাপু!

লোকটা মৃদু হাসিয়া কহিল, একাই শুন্‌বে, না দু-দশ জন লোক ডাক্‌বে? আমি বলি, দু-চার জন লোক ডাক। দু-চার জন পাড়া-পড়শীর সাম্‌নে কথাটা শোনাবে ভাল।

দয়াল ঠাকুর তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, রাগ ক'রো না [illegible]। আমি হঠাৎ বড় অন্যায় করেছি। কিছু মনে ক'রো না। [illegible] রে চল।

দুই জনে একটা ঘরে আসিয়া বসিলে, দয়াল ঠাকুর কহিলেন, তার পর?

সে কহিল, সুলোচনা—যার হাতে আপনার অন্ন প্রস্তুত হয় তাকে কোথায় পেলেন?

এইখানেই পেয়েছি। দুঃখীর কন্যা, তাই আশ্রয় দিয়েছি।

টাকাওলা লোককে আশ্রয় দিয়েছেন, এ কথা আমি বল্‌ছি না। কিন্তু সে কি জাত, তার অনুসন্ধান করেছেন কি?

দয়াল ঠাকুরের সমস্ত মুখমণ্ডল একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, ব্রাহ্মণ-কন্যা, বিধবা শুদ্ধাচারিণী, তার হাতে খেতে দোষ কি?

ব্রাহ্মণ-কন্যা এবং বিধবা, এ কথা সত্য, কিন্তু কেউ যদি কুল ত্যাগ ক'রে চ'লে যায়, তাকেও কি শুদ্ধাচারিণী বলা চলে? না, তার হাতে খাওয়া যায়?

দয়াল ঠাকুর জিভ কাটিয়া বলিলেন, শিব! শিব! তা কি খাওয়া যায়!

তবে তাই। পনেরো-ষোল বৎসর পূর্ব্বে সুলোচনা তিন বছরের একটি মেয়ে নিয়ে গৃহত্যাগ করে,এবং তাকেই আশ্রয় দিয়ে আপনি নিজের এবং আর পাঁচ জনের সর্ব্বনাশ করেছেন!

প্রমাণ?

প্রমাণ আছে বৈ কি! তার জন্য ভাবিবেন না! যাঁর সঙ্গে কুলত্যাগ করেন, সেই অসীম প্রেমাস্পদ রাখাল ভট্‌চায এখনো বেঁচে আছেন।

দয়াল লোকটার মুখের পানে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন। মনে হইল, যেন ইহারই নাম রাখাল! বলিলেন, তুমি কি ব্রাহ্মণ?

লোকটা মলিন উড়ানির ভিতর হইতে অধিকতর মলিন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন যজ্ঞোপবীত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, না, গোয়ালা!

দয়াল একটুখানি সরিয়া বসিয়া বলিলেন, তোমাকে দেখে ত চামার ব'লে মনে হয়েছিল। যা হোক্ নমস্কার।

সে ব্যক্তি রাগ করিল না। বলিল, নমস্কার। আপনার অনুমান মিথ্যা নয়, আমাকে চামার বলাও চলে, মুসলমান খ্রীষ্টান বলাও চলে। আমি জাত মানি নে—আমি পরমহংস।

তুমি অতি পাষণ্ড।

সে বলিল, সে কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন দেখি না, কেন না, ইতিপূর্ব্বে অনেকেই অনুগ্রহ ক'রে ও কথা বলেছেন। কি ছিলাম, কি হয়েচি তা এখনো বুঝি। কিন্তু আমিই রাখালদাস।

দয়ালের মুখখানি অপরিসীম ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; কোনমতে মনের ভাব দমন করিয়া তিনি বলিলেন, এখন কি করতে চাও? সুলোচনাকে নিয়ে যাবে?

আজ্ঞে না। তাতে আপনার খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হবে, আমি অত নরাধম নই।

প্রাণের দায়ে দয়াল [illegible] পরিহাসটাও পরিপাক করিলেন। [illegible] বলিলেন, তবে কি চাও? আবার এসেচ কেন?

[illegible]। দারুণ অর্থাভাব, তাই আপাতত এসেছি। হাজার দুই পেলেই নিঃশব্দে চলে যাব, জানাতে এসেছি।

এত টাকা তোমাকে কে দেবে ?

যার গরজ। আপনি দেবেন—সুলোচনার জামাই দেবে—সে বড়লোক।

দয়াল তাহার স্পর্দ্ধা দেখিয়া মনে মনে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কিন্তু সে যে অতিশয় ধূর্ত্ত এবং কৌশলী, তাহাও বুঝিলেন। বলিলেন, বাপু, আমি দরিদ্র, অত টাকা কখনও চোখে দেখি নি। তবে সুলোচনার জামাই দিতে পারে সে কথা ঠিক। কিন্তু সে দেবে না। তাকে চেন না, ভয় দেখিয়ে তার কাছ থেকে দুহাজার ত ঢের দূরের কথা—দুটো পয়সাও আদায় করতে পারবে না। তুমি যে বুদ্ধিমান লোক তা টের পেয়েচি, কিন্তু সে আরও বুদ্ধিমান। বরং আর কোন ফন্দি দেখ—এ খাটবে না।

রাখাল দয়ালের মুখের দিকে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে চাহিয়া থাকিয়া মৃদু হাসিল। বলিল, সে ভাবনা আমার। দেখা যাক্ যত্ন ক'রে যদি—

দয়াল তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন, থাক্ বাপু, দেব-জামাটাকে আর অপবিত্র ক'রো না।

রাখাল সপ্রতিভভাবে বলিল, যে আজ্ঞে। কিন্তু আর ত বলতে পাচ্চি নে—বলি তাঁর ঠিকানাটা কি ?

দয়াল বলিলেন, সুলোচনাকেই জিজ্ঞাসা কর না বাপু।

রাখাল কহিল, সে বল্‌বে না, কিন্তু আপনি বল্‌বেন।

যদি না বলি ?

রাখাল শান্তভাবে বলিল, নিশ্চয়ই বল্‌বেন। আচ্ছা, না বল্লে কি কর্‌ব তা ত পূর্ব্বেই বলেছি।

দয়ালের মুখ শুকাইল। তিনি বলিলেন, আমি তোমার কিছুই ত করি নি বাপু।

রাখাল বলিল, না, কিছু করেন নি। তাই এখন কিছু কর্‌তে বলি। নাম-ধামটা ব'লে দিলে জামাইবাবুকেও দুটো আশীর্ব্বাদ ক'রে আসি, মেয়েটাকেও একবার দেখে আসি। অনেক দিন দেখি নি।

দয়াল ঠাকুর রীতিমত ভয় পাইয়াছিলেন। কিন্তু মুখে সাহস দেখাইয়া কহিলেন, আমি তোমার সাহায্য কর্‌ব না। তোমার যা ইচ্ছা কর। অজ্ঞাতে একটা পাপ করেছি, সে [illegible] প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ব। আমার আর ভয় কি?

ভয় কিছুই নেই, তবে পাণ্ডা-মহলে আজই এ কথা রাষ্ট্র হবে। তার পর যেমন ক'রে পারি, অনুসন্ধান ক'রে সুলোচনার জামাইয়ের কাছে যাব, এবং সেখানেও এ কথা প্রকাশ কর্‌ব। নমস্কার ঠাকুর, আমি চল্‌লাম।

সত্যই সে চলিয়া যায় দেখিয়া দয়াল তাহার হাত ধরিয়া পুনর্ব্বার বসাইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, বাপু, তুমি যে অল্পে ছাড়বার পাত্র নও, তা বুঝেছি। রাগ ক'রো না। আমার কথা শোন। এর মধ্যে তুমি এ কথা নিয়ে আর আন্দোলন ক'রো না। হপ্তা-খানেক পরে এস, তখন যা হয় কর্‌ব।

মনে রাখবেন, সেদিন এমন ক'রে ফেরালে চল্‌বে না। দয়াল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, বাপু, তুমি কি জাতি বামুনের ছেলে?

আজ্ঞে।

দয়াল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আশ্চর্য্য! আচ্ছা হপ্তা-খানেক পরেই এস—এর মধ্যে আর আন্দোলন ক'রো না, বুঝলে?

আজ্ঞে, বলিয়া রাখাল দুইএক পা গিয়াই ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, ভাল কথা। গোটা-দুই টাকা দিন ত। মাইরি, মনি-ব্যাগটা কোথায় যে হারালাম, বলিয়া সে দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল।

দয়াল রাগে তাহার পানে আর চাহিতেও পারিলেন না। নিঃশব্দে দুইটা টাকা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলেন, সে তাহা ট্যাঁকে গুঁজিয়া প্রস্থান করিল।

সে চলিয়া গেল, কিন্তু সেইখানে দয়াল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ যেন সহস্র বৃশ্চিকের দংশনে জ্বলিয়া যাইতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কিন্তু সুলোচনা কোথায়? আজ তিন দিন ধরিয়া হরিদয়াল আহার, নিদ্রা, পূজা, পাঠ, যাত্রীর অনুসন্ধান সব বন্ধ রাখিয়া তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত কাশী খুঁজিয়াও যখন তাহাকে বাহির করিতে পারিলেন না, তখন ঘরে ফিরিয়া আসিয়া শিরে করাঘাত করিয়া বলিলেন, বিশ্বেশ্বর! এ কি দুর্দ্দৈব! অনাথাকে দয়া করতে গিয়ে শেষে কি পাপ সঞ্চয় করলাম!

গলির শেষে কৈলাস খুড়ার বাটী। হরিদয়াল সেখানে আসিয়া দেখিলেন, কেহ নাই। ডাকিলেন, খুড়ো বাড়ি আছ?

কেহ সাড়া দিল না দেখিয়া তিনি ঘরের মধ্যে আসিলেন, দেখিলেন, কৈলাস প্রদীপের আলোকে নিবিষ্ট চিত্তে সতরঞ্চ সাজাইয়া একা বসিয়া আছে; বলিলেন, খুড়ো, একাই দাবা খেল্‌চ?

খুড়ো চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, এস বাবাজী, এই চালটা বাঁচাও দেখি।

হরিদয়াল বিরক্ত হইয়া মনে মনে গালি পাড়িয়া কহিলেন, নিজের জাত বাঁচে না, ও বলে কি না দাবার চাল বাঁচাও!

কৈলাসের কানে কথাগুলা অর্দ্ধেক প্রবেশ করিল, অর্দ্ধেক করিল না। জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বল বাবাজী?

বলি সেদিনের ব্যাপারটা সব শুনেছিলে?

কি ব্যাপার?

সেই যে আমাদের বাড়ির ভিতরের সেদিনকার গোলযোগ!

কৈলাস কহিলেন, না বাবাজী, ভাল শুনতে পাই নি। গোলযোগ বোধ করি, খুব আস্তে আস্তে হয়েছিল; কিন্তু সেদিন তোমার দাবাটা আচ্ছা চেপেছিলাম!

হরিদয়াল মনে মনে তাহার মুণ্ডপাত করিয়া কহিলেন, তা ত চেপেছিলে, কিন্তু কথাগুলো কি কিছুই শোন নি?

কৈলাস ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, না, কিছুই প্রায় শুনতে পাই নি। অত আস্তে আস্তে গোলমাল করলে কি ক'রে শুনি বল? কিন্তু সেদিনকার খেলাটা কি রকম জমেছিল, মনে আছে?

মন্ত্রীটা তুমি কোনমতেই বাঁচাতে পারবে না—আচ্ছা, এই কিস্তি ছিল। কে বাঁচাও দেখি কেমন—

হরিদয়াল বিরক্ত হইয়া বলিলেন, মন্ত্রী চুলোয় যাক্! জিজ্ঞেস করি, সেদিনকার কথাবার্ত্তা কিছু শোন নি?

খুড়া হরিদয়ালের বিরক্ত মুখের দিকে চাহিয়া এইবার একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, কি জানি বাবাজী, স্মরণ ত কিছুই হয় না।

হরিদয়াল ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, আচ্ছা, সংসারের যেন কোন কাজই না করলে, কিন্তু পরকালটা মান ত?

মানি বৈ কি!

তবে! সেকালের একটা কাজও করেছ কি? এক দিনের তরেও মন্দিরে গিয়েছিলে কি?

কৈলাস বিস্মিত হইয়া বলিলেন, কি বল দয়াল, মন্দিরে যাই নি! কত দিন গিয়েছি।

দয়াল তেমনি গম্ভীর হইয়াই বলিতে লাগিলেন, তুমি এই বিশ বৎসর কাশীবাসী হয়েছ, কিন্তু বোধ হয় বিশ দিনও ঠাকুর দর্শন কর নি—পূজা পাঠ ত দূরের কথা!

কৈলাস প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, না দয়াল, বিশ দিনের বেশি হবে; তবে কি জান বাবাজী, সময় পাই না বলেই পূজোটুজোগুলো হয়ে উঠে না। এই দেখ না, সকাল-বেলাটা শম্ভু মিশিরের সঙ্গে এক চাল বসতেই হয়—লোকটা খেলে ভাল। এক বাজী শেষ হ'তেই দুপুর বেজে যায়, তার পর আহ্নিক সেরে পাক করতে,

আহার করতে বেলা শেষ হয়। তার পরে বাবাজী, গঙ্গা পাঁড়ের—তা যাই বল, লোকটার খেলার বড় তারিফ—আমাকে ত সেদিন প্রায় মাৎ করেছিল। ঘোড়া আর গজদুটো দুকোণ থেকে চেপে এসে—আমি বলি বুঝি—

আঃ! থামো খুড়ো! দুপুর-বেলা কি কর, তাই বল।

দুপুর-বেলা! গঙ্গা পাঁড়ের সঙ্গে, তার গজ দুটো—এই কালই দেখ না—

দয়াল অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বাধা দিয়া বলিলেন, হয়েছে হয়েছে, দুপুর-বেলা গঙ্গা পাঁড়ে, আর সন্ধ্যার পর মুকুন্দ ঘোষের বৈঠকখানা, আর তোমার সময় কোথায়?

কৈলাস চুপ করিয়া রহিলেন, হরিদয়াল অধিকতর গম্ভীর হইয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন, কিন্তু খুড়ো, দিনও ত আর বেশি নেই। পরকালের জন্যও প্রস্তুত হওয়া উচিত, আর সে কথা কিছু কিছু ভাবাও দরকার। দাবার পুঁটলিটা আর সঙ্গে নিতে পারবে না।

কৈলাস হঠাৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, না দয়াল, দাবার পুঁটলিটা বোধ করি সঙ্গে নিতে পারব না। আর প্রস্তুত হবার কথা বলচ বাবাজী? প্রস্তুত আমি হয়েই আছি। যে দিন ডাক্ আসবে, ঐটে কারু হাতে তুলে দিয়ে সোজা রওনা হয়ে পড়ব, সেজন্য চিন্তার বিষয় আর কি আছে?

কিছুই নেই? কোন শঙ্কা হয় না?

কিছু না বাবাজী, কিছু না। যেদিন কমলা আমার চলে গেল,

যেদিন কমলাচরণ আমার মুখের পানেই চোখ রেখে চোখ বুজ্‌লে, সেদিন থেকেই শঙ্কা, ভয় প্রভৃতি উপদ্রবগুলো তাদের পিছনে পিছনেই চলে গেল, কেমন ক'রে যে গেল, সে কথা এক দিনের তরে জান্‌তে পারলাম না বাবাজী, বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চোখ দুটি ছল্‌ ছল্‌ করিয়া আসিল।

দয়াল বাধা দিয়া বলিলেন, থাক্‌ সে-সব কথা। এখন আমার কথাটা শুন্‌বে?

বল বাবাজী।

দয়াল তখন সেদিনের কাহিনী একে একে বিবৃত করিয়া বলিলেন, এখন উপায়?

শুনিতে শুনিতে কৈলাসের সদাপ্রফুল্ল মুখশ্রী পাংশুবর্ণ হইল। কাতর-কণ্ঠে তিনি বলিলেন, এমন হয় না হরিদয়াল। সুলোচনা সতী-সাবিত্রী ছিলেন।

দয়াল কহিলেন, আমিও তাই ভেবেছিলাম, কিন্তু স্ত্রীলোকে সকলই সম্ভব।

ছি, অমন কথা মুখে এনো না। মানুষ মাত্রেই পাপ পুণ্য করে থাকে, এতে স্ত্রী-পুরুষের কোন প্রভেদ দেখি নে। বাবাজী, তোমার জননীর কথা কি স্মরণ হয় না, সে স্মৃতি একেবারে মুছে ফেলেচ?

হরিদয়াল লজ্জিত হইলেন, অথচ বিরক্তও হইলেন। কিছুক্ষণ অধোমুখে থাকিয়া তিনি বলিলেন, কিন্তু এখন যে জাত যায়?

কৈলাস বলিলেন, একটা প্রায়শ্চিত্ত কর। অজানা পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই কি?

আছে, কিন্তু এখানকার লোকে আমাকে যে একঘরে করবে। কর্‌লেই বা—

হরিদয়াল এবার বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, কর্‌লেই বা! কি বল্‌চ? একটু বুঝে বল খুড়ো।

বুঝেই বল্‌চি দয়াল। তোমার বয়সও কম হয় নি, বোধ করি পঞ্চাশ পার হ'ল। এতটা বয়স জাত ছিল, বাকি দু-চার বছর না হয় নাই রইল বাবাজী, এতই কি তাতে ক্ষতি?

ক্ষতি নেই? জাত যাবে, ধর্ম্ম যাবে, পরকালে জবাব দেব কি?

কৈলাস কহিলেন, এই জবাব দেবে যে একজন অনাথাকে আশ্রয় দিয়েছিলে।

হরিদয়াল চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কথাটা তাঁহার মনের সঙ্গে একেবারেই মিলিল না। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, তবে সুলোচনার জামাইয়ের ঠিকানা দেব না?

কিছুতেই না। এক ব্যাটা বদমায়েস, মাতাল—সে ভয় দেখিয়ে তোমার কাছে টাকা আদায় করবে, আর এক ভদ্র-সন্তানের কাছে টাকা আদায় করবে, আর তুমি তার সাহায্য করবে।

কিন্তু না করলে যে আমার সর্ব্বস্ব যায়! একজনও যজমান আসবে না। আমি খাব কি করে?

কৈলাস বলিলেন, সে ভয় ক'রো না। আমি সরকার বাহা-দুরের কল্যাণে বিশ টাকা পেন্সন পাই, খুড়ো ভাইপোর তাতেই চলে যাবে। আমরা খাব, আর দাবা খেলব, ঘর থেকে কোথাও নড়ব না।

বিরক্ত হইলেও এরূপ বালকের মত কথায় হরিদয়াল হাসিয়া বলিলেন, খুড়ো, আমার বোঝা তুমিই বা কেন ঘাড়ে নেবে, আর আমিই বা কেন পরের হাঙ্গামা মাথায় বয়ে জাত-ধর্ম্ম খোয়াব? তার চেয়ে—

কৈলাস বলিলেন, ঠিক্ ত। তার চেয়ে তাঁদের নাম-ধাম ঠিকানা বলে দিয়ে একজন দরিদ্র বালিকাকে তার স্বামী, সংসার, সম্মান সমস্ত হতে বঞ্চিত করে এই বুড়ো হাড়-গোড়গুলা ভাগাড়ের শিয়াল-কুকুরের গ্রাস থেকে বাঁচাতেই হবে! বাঁচাও গে বাবাজী, কিন্তু আমাকে বলতে এসে ভাল কর নি। তবে যখন মতলব নিতেই এসেছ, তখন আর একটা কথা বলে দিই। ৺কাশীধাম; মা অন্নপূর্ণার রাজত্ব। এখানে বাস করে তাঁর সতী মেয়েদের পিছনে লেগে মোটের উপর বড় সুবিধা হবে না বাবা!

হরিদয়াল ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, খুড়ো কি এবার শাপ-সম্পাত কর্‌চ?

না। তোমরা কাশীর পাণ্ডা, স্বয়ং বাবার বাহন, আমাদের শাপ-সম্পাত তোমাদের লাগ্‌বে না, সে ভয় তোমার নেই—কিন্তু যে কাজে হাত দিতে যাচ্চ বাবা, সে বড় নিরাপদ জিনিষ নয়। সতী-সাবিত্রীকে যমে ভয় করে। সেই কথাটাই মনে করিয়ে দিচ্চি। অনেক দিন একসঙ্গে দাবা খেলেচি—তোমাকে ভালও বাসি।

হরিদয়াল জবাব দিলেন না, মুখ কালি করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

কৈলাস বলিলেন, বাবাজী, কথাটা তা হ'লে রাখ্‌বে না ?

হরিদয়াল বলিলেন, পাগলের কথা রাখ্‌তে গেলে পাগল হওয়া দরকার।

কৈলাস চুপ করিয়া রহিলেন, হরিদয়াল বাহির হইয়া গেলেন।

কৈলাস দাবার পুঁটুলিটা টানিয়া লইয়া গ্রন্থি বাঁধিতে বাঁধিতে মনে মনে ভাবিলেন, বোধ করি ওর কথাই ঠিক। আমার পরামর্শ হয়ত সংসারে সত্যই চলে না। মানুষ মরিলে লোকাভাব হইলে কেহ কেহ ডাকিতে আসে—দাহ করিতে হইবে। রোগ হইলে ডাকিতে আসে—শুশ্রূষা করিতে হইবে, আর সতরঞ্চ খেলিতে আসে। কই, এত বয়স হইল কেহ ত কখন পরামর্শ করিতে আসে নাই।

কিন্তু অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ভাবিয়াও তিনি স্থির করিতে পারিলেন না—কেন এই সূর্য্যের আলোর মত পরিষ্কার এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ জিনিষটা লোক-গ্রাহ্য হয় না, কেন এই সহজ প্রাঞ্জল ভাষাটা সংসারের লোক বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

সেই রাত্রেই হরিদয়াল অনেক চিন্তার পর মন স্থির করিয়া চন্দ্রনাথের খুড়ো মণিশঙ্করকে পত্র লিখিয়া দিলেন যে চন্দ্রনাথ স্বেচ্ছায় এক বেশ্যা-কন্যা বিবাহ করিয়া ঘরে লইয়া গিয়াছেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

হরিদয়াল সমস্ত কথা পরিষ্কার করিয়া মণিশঙ্করকে লিখিয়া দিয়াছিলেন। সেই জন্যই তাঁহার সহজেই বিশ্বাস হইল সম্বাদটা অসত্য নহে। কিন্তু বুঝিতে পারিলেন না এস্থলে কর্ত্তব্য কি! এ সম্বাদ তাঁহার পক্ষে সুখেরই হোক বা দুঃখেরই হোক, গুরুতর তাহাতে সন্দেহ নাই। এত ভার তাঁহার একা বহিতে ক্লেশ বোধ হইল, তাই স্ত্রীকে নিরিবিলিতে পাইয়া মোটামুটি খবরটা জানাইয়া বলিলেন, আমার পরামর্শ নিলে কি এমন হ'ত? না এত বড় জুয়াচুরি ঘটতে দিতাম? যাই হোক্ কথাটা এখন প্রকাশ ক'রো না, ভাল করে ভেবে দেখা উচিত। কিন্তু ভাল করিয়া ভাবিতে সময় লাগে, দুই-চারি দিন অপেক্ষা করিতে হয়, স্ত্রীলোক এতটা পারে না, তাই হরিদয়ালের পত্রের মর্ম্মার্থ দুই-চারি কান করিয়া ক্রমশঃ সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মেয়ে দেখার দিন হরিবালা শুনিতে পাইয়াছিলেন, তাই ভয়ে ভয়ে সেদিন জানিতে আসিয়াছিলেন, চন্দ্রনাথ সরযূকে কতখানি ভালবাসেন। সেদিন মেয়ে-মহলে অস্ফুট-কলকণ্ঠে এ প্রশ্নটা খুব উৎসাহের সহিত আলোচিত হইয়াছিল, কেন না তাহারাই প্রথমে বুঝিয়াছিল যে শুধু ভালবাসার গভীরতার উপরেই সরযূর ভবিষ্যৎ নিহিত আছে।

সকলেই চাপা গলায় কথা কহে, সকলের মুখে চোখে প্রকাশ পায় যে, একটা পৈশাচিক আনন্দ প্রবাহ এই কোমল বক্ষগুলির মধ্যে ছুটিয়া ফিরিতেছে। দুঃখপ্রকাশ এবং দীর্ঘশ্বাস ত আছেই, কিন্তু সকলেরই যেন গোপন ইচ্ছা সরযূর ভাগ্যদেবতা যে দিকে মুখ

ফিরাইলে তাহারা অত্যন্ত দুঃখের সহিত 'আহা' বলিবে, সেই পরম দুঃখের চিত্রটি যেন তাহারা দেখিতে পায়। আজ দুই দিন ধরিয়া উৎকণ্ঠায় তাহাদের নিদ্রা হয় না। ক্রমে এক সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল। এই রাতদিন শুধু ধুঁয়া হইয়াছে, আগুন জ্বলিতে হয়। শুধু মেয়েদের মধ্যে বাধাপ্রাপ্ত স্রোতের মত হইয়াছে তাহা কিছুতেই গিয়াছে, অথচ দুকূল ভাসাইয়া বহিতে

একথা উঠিতেছিল, কিন্তু তাহা অল্প সময় বাকি কি? একমুঠো জাতি মারা ভিন্ন আরও কাজ আছে। বার থাক্‌লে কি তুমি এমন হয়—একেবারে পা ছড়াইয়া দিয়া অ!

পায় না, তাই কথাটা মীমাংসা না থাকিয়া একটা শান্তভাবে তবে কথাটা যদি ছোট

বোধ করি যেমন দিয়া মিথ্যা চোখ মুছিয়া বলিলেন, পোড়া এরূপ স্থলে কেহ তাই হয়েচে। আমার সোণার চাঁদ তুমি, তোমাড়াইবার কনীয়া ভুলিয়ে এই কাণ্ড করেচে।

পড়ি মামিমা, খুলে বল!

আর কি বল্‌ব। তোমার খুড়োকে জিজ্ঞেস্ কর।

চন্দ্রনাথ এবার বিরক্ত হইল। বলিল, খুড়োকেই যদি জিজ্ঞেস কর্‌ব, তবে তুমি অমন কর্‌চ কেন?

আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে, তাই এমন কচ্চি বাবা, আর কেন?

চন্দ্রনাথ মাতুল ও মাতুলানীকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি করিত, কিন্তু এরূপ ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইতে হয়, সে বিরক্ত হইয়াছিল,

প্রথমটা হরকালী বিহ্বলের মত চাহিয়া রহিলেন, তাহার পরে বলিলেন, কি হয়েছে ?

রামময়ের বৃদ্ধা জননী ফোঁস্ করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, অসত্য নহে। গিন্নী, যা হবার তাই হয়েছে—সর্ব্বনাশ হয়েছে।
এ সম্বাদ তাঁহার পক্ষে আর একবার আগাগোড়া বিবৃত করিয়া
তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং ভুল-ভ্রান্তি যাহা ঘটিল তাহা আর
হইল, তাই স্ত্রীকে নিরিবিলি দিল। এইরূপে হরকালী হৃদয়ঙ্গম
বলিলেন, আমার পরামর্শ য়াছে। কিন্তু সেটা কতটা তাঁহার
জুয়াচুরি ঘটতে দিতাম ? জনের, সেই কথাটাই বেশ করিয়া
ক'রো না, ভাল করে ভেবে ইয়া গিয়া নিজের ঘরের মধ্যে দ্বার
ভাবিতে সময় লাগে, দুই-চারি দিন সিয়াছিলেন তাঁহারা ভ ক
এতটা পারে না, তাই হরিদয়ালের পত্রের িয়া হতবুদ্ধি হ ন
করিয়া ক্রমশঃ সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ভত ঘরের ম ন
হরিবালা শুনিতে পাইয়াছিলেন, তাই ভয়ে ভয়ে সে সুসম্বাদিতে আসিয়াছিলেন, চন্দ্রনাথ সরযুকে কতখানি ভালবাসেন। সেদিন মেয়ে-মহলে অস্ফুট-কলকণ্ঠে এ প্রশ্নটা খুব উৎসাহের সহিত আলোচিত হইয়াছিল, কেন না তাহারাই প্রথমে বুঝিয়াছিল যে শুধু ভালবাসার গভীরতার উপরেই সরযূর ভবিষ্যৎ নিহিত আছে।

সকলেই চাপা গলায় কথা কহে, সকলের মুখে চোখে প্রকাশ পায় যে, একটা পৈশাচিক আনন্দ প্রবাহ এই কোমল বক্ষগুলির মধ্যে ছুটিয়া ফিরিতেছে। দুঃখপ্রকাশ এবং দীর্ঘশ্বাস ত আছেই, কিন্তু সকলেরই যেন গোপন ইচ্ছা সরযূর ভাগ্যদেবতা যে দিকে মুখ

তাঁহার মুখের ভয়ঙ্কর ভাব দেখিয়া চন্দ্রনাথ চিন্তিত হইয়া বলিল, কি হয়েছে মামিমা ?

হরকালী শিরে করাঘাত করিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিলেন, বাবা চন্দ্রনাথ, দুঃখী ব'লে কি আমাদের এত শাস্তি দিতে হয় ।

চন্দ্রনাথ হতবুদ্ধি হইয়া গেল, সে কি করিয়াছে তাহা কিছুতেই ভাবিয়া পাইল না ।

হরকালী বলিতে লাগিলেন, আর বাকি কি ? একমুঠো ভাতের জন্ত জাত গেল । বাবা, খাবার থাক্‌লে কি তুমি এমন করে আমাদের সর্ব্বনাশ করতে পার্‌তে !

চন্দ্রনাথ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া অনেকটা শান্তভাবে কহিল, হয়েছে কি ?

হরকালী আঁচল দিয়া মিথ্যা চোখ মুছিয়া বলিলেন, পোড়া কপালে যা হবার তাই হয়েচে । আমার সোণার চাঁদ তুমি, তোমাকে ডাকিনীরা ভুলিয়ে এই কাণ্ড করেচে ।

পায়ে পড়ি মামিমা, খুলে বল ।

আর কি বল্‌ব । তোমার খুড়োকে জিজ্ঞেস্ কর ।

চন্দ্রনাথ এবার বিরক্ত হইল । বলিল, খুড়োকেই যদি জিজ্ঞেস কর্‌ব, তবে তুমি অমন কর্‌চ কেন ?

আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে, তাই এমন কচ্চি বাবা, আর কেন ?

চন্দ্রনাথ মাতুল ও মাতুলানীকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি করিত, কিন্তু এরূপ ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইতে হয়, সে বিরক্ত হইয়াছিল,

আরও বিরক্ত হইয়া বলিল, যদি সর্ব্বনাশ হয়েই থাকে ত অন্য ঘরে যাও—আমার সাম্‌নে অমন ক'রো না।

হরকালী তখন চন্দ্রনাথের মৃতা জননীর নামোচ্চারণ করিয়া উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন, ওগো তুমি আমাদের ডেকে এনেছিলে, আজ তোমার ছেলে তাড়িয়ে দিতে চায় গো।

চন্দ্রনাথ ব্যাকুল হইয়া মামির হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, খুলে না বল্‌লে কেমন করে বুঝব মামি, কিসে তোমাদের সর্ব্বনাশ হ'ল? সর্ব্বনাশ সর্ব্বনাশই করচো, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত একটা কথাও বল্‌তে পার্‌লে না!

হরকালী আর একবার চোখ মুছিয়া বলিলেন, কিছুই জান না বাবা?

না।

তোমার খুড়োকে কাশী থেকে তোমাদের পাণ্ডা চিঠি লিখেচে—

কি লিখেচে।

হরকালী তখন ঢোক গিলিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, বাবা, কাশীতে তোমাকে একা পেয়ে ডাকিনীরা ভুলিয়ে যে বেশ্যার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিয়েচে।

চন্দ্রনাথ বিস্ফারিত-চক্ষে প্রশ্ন করিল, কার গো?

শিরে করতাড়না করিয়া হরকালী বলিলেন, তোমার।

চন্দ্রনাথ কাছে সরিয়া ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কার বেশ্যার সঙ্গে বিয়ে হয়েচে? আমার?

হাঁ।

তার মানে, বিয়ের পূর্ব্বে সরযূ বেশ্যাবৃত্তি কর্‌ত? মামিমা, ওকে যে দশ বছরেরটি ঘরে এনেছি, সে কথা কি তোমার মনে নাই?

তা ঠিক জানি নে চন্দরনাথ, কিন্তু ওর মায়ের কাশীতে নাম আছে।

তবে সরযূর মা বেশ্যাবৃত্তি কর্‌ত। ও নিজে নয়?

হরকালী মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন, ও একই কথা বাবা, একই কথা।

চন্দ্রনাথ ধমক দিয়া উঠিলেন, কাকে কি বল্‌চ মামি? তুমি কি পাগল হয়েছ?

ধমক খাইয়া হরকালী কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিতে লাগিলেন, পাগল হবারই কথা যে বাবা! আমাদের দুজনের প্রায়শ্চিত্ত করে দাও, তার পরে যে দিকে দুচক্ষু যায়, আমরা চলে যাই। এর চেয়ে ভিক্ষে করে খাওয়া ভাল।

চন্দ্রনাথ রাগের মাথায় বলিল, সেই ভাল।

তবে চলে যাই?

চন্দ্রনাথ মুখ ফিরাইয়া বলিল, যাও।

তখন হরকালী আবার সশব্দে কপালে করাঘাত করিলেন, হা পোড়াকপাল! শেষে এই অদৃষ্টে ছিল!

চন্দ্রনাথ মুখ ফিরাইয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, তবু পরিষ্কার করে বলবে না?

সব ত বলছি।
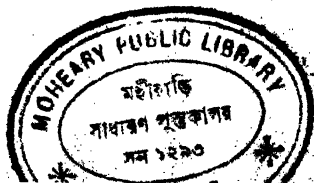
কিছুই বল নি, চিঠি কই ?

তোমার কাকার কাছে।

তাতে কি লেখা আছে ?

তাও ত বলেছি।

চন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিয়া একটা চৌকির উপর বসিয়া পড়িল। গভীর লজ্জায় ও ঘৃণায় তাহার পদতল হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত বার-দুই শিহরিয়া উঠিয়া সমস্ত দেহটা যেন অসাড় হইয়া আসিতে লাগিল! তাহার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল, ছিঃ!

হরকালী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মনে মনে ভয় পাইলেন, এমন ভীষণ কঠোর ভাব কোন মৃত মানুষের মুখেও কেহ কোন দিন দেখে নাই। তিনি নিঃশব্দে উঠিয়া গেলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

চন্দ্রনাথ কহিল, কই চিঠি দেখি ?

মণিশঙ্কর নিঃশব্দে বাক্স খুলিয়া একখানি পত্র তাঁহার হাতে দিলেন। চন্দ্রনাথ সমস্ত পত্রটা বার-দুই পড়িয়া শুষ্কমুখে প্রশ্ন করিল, প্রমাণ ?

রাখালদাস নিজেই আসচে।

তাঁর কথায় বিশ্বাস কি ?

তা বলতে পারি নে। যা ভাল বিবেচনা হয়, তখন ক'রো।

সে কি জন্ত আসচে ? এ কথা প্রমাণ করে তার লাভ ?

লাভের কথা ত চিঠিতেই লেখা আছে। দুহাজার টাকা চায়।

চন্দ্রনাথ তাঁহার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া সহজভাবে কহিল, একথা প্রকাশ না হলে সে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করতে পারত, কিন্তু সে আশায় তার ছাই পড়েচে। আপনি এক হিসাবে আমার উপকার করেছেন, এতগুলো টাকা বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

মণিশঙ্কর লজ্জায় মরিয়া গেলেন। ইচ্ছা হইল বলেন যে, তিনি একথা প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু তখনি স্মরণ হইল, তাঁহার দ্বারাই ইহা প্রকাশিত হইয়াছে! স্ত্রীকে না বলিলে কে জানিতে পারিত। সুতরাং অধোমুখে বসিয়া রহিলেন।

চন্দ্রনাথ পুনরায় কহিল, এ গ্রাম আমাদের। অথচ একজন হীন লম্পট ভিক্ষুক আমাকে অপমান করবার জন্য আমার গ্রামে আমার বাড়িতে আস্চে যে কি সাহসে সে কথা আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই নে, কিন্তু এই কথাটা আজ আপনাকে জিজ্ঞাসা করি কাকা, আমার মৃত্যু হলে কি আপনি সুখী হন।

মণিশঙ্কর জিভ কাটিয়া কহিলেন, ছি ছি, অমন কথা মুখেও এ[illegible] না চন্দ্রনাথ।

চন্দ্রনাথ কহিল, আর কোনদিন আন্‌বার আবশ্যক হবে না। আপনি আমার পূজনীয়, আর যদি কোন অপরাধ করি মার্জ্জনা করবেন। আমার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি আপনি নিন, নিয়ে আমার পরে প্রসন্ন [illegible]ন। শুধু যেখানেই থাকি কিছু কিছু মাসহারা [illegible]বেন—ঈশ[illegible] শপথ করে বলছি এর বেশি আর কিছু চাইব না। কিন্তু [illegible]শ আমার করবেন না। তাহার কণ্ঠ রোধ হইয়া

আসিল এবং অধর দাঁত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া সে কোন মতে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন থামাইয়া ফেলিল।

মণিশঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইয়া চন্দ্রনাথের ডান হাত চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, বাবা চন্দ্রনাথ, স্বর্গীয় অগ্রজের তুমি একমাত্র বংশধর—আমি ভিক্ষা চাইচি বাবা, আর এ বৃদ্ধকে তিরস্কার ক'রো না।

চন্দ্রনাথ মুখ ফিরাইয়া চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, তিরস্কার করি না কাকা। কিন্তু এত বড় দুর্ভাগ্যের পর দেশ ত্যাগ করা ছাড়া আমার অন্য উপায় নেই, সেই কথাই আপনাকে বল্‌ছিলাম।

মণিশঙ্কর বিস্ময়ের স্বরে কহিলেন, দেশ ত্যাগ করবে কেন? না জেনে এরূপ বিবাহ করেচ, তাতে বিশেষ লজ্জার কারণ নেই—শুধু একটা প্রায়শ্চিত্ত করা বোধ করি প্রয়োজন হবে। চন্দ্রনাথ মৌন হইয়া রহিল। মণিশঙ্কর উৎসাহিত হইয়া পুনরায় কহিলেন, উপায় যথেষ্ট আছে। বৌমাকে পরিত্যাগ করে একটা গোপনে প্রায়শ্চিত্ত কর। আবার বিবাহ করে সংসারী হও, সকল দিক রক্ষা হবে।

চন্দ্রনাথ শিহরিয়া উঠিল।

সংসারাভিজ্ঞ মণিশঙ্কর তাহা লক্ষ্য করিয়া স্থির-দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

চন্দ্রনাথ কহিল, কোন মতেই পরিত্যাগ করতে পারব না কাকা।

মণিশঙ্কর কহিলেন, পারবে চন্দ্রনাথ। আজ বিশ্রাম কর গে, কাল সুস্থিরচিত্তে ভেবে দেখো এ কাজ শক্ত নয়। বৌমাকে কিছুতেই গৃহে স্থান দেওয়া যেতে পারে না।

কিন্তু প্রমাণ না নিয়ে কিরূপে ত্যাগ করতে অনুমতি করেন।

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, অধিক প্রমাণ যাতে না হয় সে উপায় করব। কিন্তু তোমাকেও আপাততঃ ত্যাগ করতে হবে। ত্যাগ করে প্রায়শ্চিত্ত করলেই গোল মিটবে।

কে মেটাবে?

আমি মেটাব।

কিন্তু কিছুমাত্র অনুসন্ধান না করেই—

ইচ্ছা হয় অনুসন্ধান পরে ক'রো। কিন্তু একথা যে মিথ্যা নয়, তা আমি তোমাকে নিশ্চয় বললাম।

চন্দ্রনাথ বাটী ফিরিয়া আসিয়া নিজের ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া খাটের উপর শুইয়া পড়িল; মণিশঙ্কর বলিয়াছেন, সরযূকে ত্যাগ করিতে হইবে। শয্যার উপর পড়িয়া শূন্য-দৃষ্টিতে উপরের দিকে চাহিয়া মানুষ ঘুমাইয়া যেমন করিয়া কথা কহে, ঠিক্ তেমনি করিয়া সে ঐ একটা কথা পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করিতে লাগিল। সরযূকে ত্যাগ করিতে হইবে, সে বেশ্যার কন্যা। কথাটা সে অনেক বার অনেক রকম করিয়া নিজের মুখে উচ্চারণ করিল, নিজে কান পাতিয়া শুনিল, কিন্তু মনে বুঝিতে পারিল না। সে সরযূকে ত্যাগ করিয়াছে—সরযূ বাটীর মধ্যে নাই, ঘরের মধ্যে নাই, চোখের সুমুখে নাই, চোখের আড়ালে নাই, সে আর তাঁহার নাই। বস্তুটা

যে ঠিক কি এবং কি তাহার সম্পূর্ণ আকৃতি, সহস্র চেষ্টাতেও তাহা সে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারিল না। অথচ মণিশঙ্কর বলিয়াছেন কাজটা শক্ত নয়। কাজটা শক্ত, কি সহজ, পারা যায়, কি যায় না, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইবার মত শক্তি, মানুষের হৃদয়ে আছে কি না, তাহাও সে স্থির করিতে পারিল না। সে নির্জ্জীবের মত পড়িয়া রহিল এবং এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইয়া কত কি স্বপ্ন দেখিল, কোনটা স্পষ্ট, কোনটা ঝাপসা। ঘুমের ঘোরে কি এক রকমের অস্পষ্ট ব্যথা তাহার সর্ব্বাঙ্গে যেন নড়িয়া বেড়াইতে লাগিল তাহাও সে অনুভব করিল। তাহার পর সন্ধ্যা যখন হয় হয় এমন সময় সে জাগিয়া উঠিয়া বসিল। তাহার মানসিক অবস্থা তখন এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে মায়া মমতার ঠাঁই নাই, রাগ করিবার, ঘৃণা করিবারও ক্ষমতা নাই। শুধু একটা অব্যক্ত অবোধ্য লজ্জার গুরুভারে তাহার সমস্ত দেহ মন ধীরে ধীরে অবশ ও অবনত হইয়া একেবারে মাটির সহিত মিশিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে।

এমনি সময়ে বাতি জ্বালিয়া আনিয়া ভৃত্য কক্ষ-দ্বারে [illegible] চন্দ্রনাথ ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পড়িল এবং কপা[illegible] ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। চোখের [illegible] লাগিয়া তাহার মোহের [illegible] আপনিই [illegible] আসিয়াছিল, এবং তাহারই ভিতর দিয়া এখন হঠাৎ [illegible] কথাটা সত্য কি? সরযূ নিজে জানে কি? [illegible] তাহার সরযূ তাহারই এত বড় সর্ব্বনাশ করিবে এ কথা চন্দ্রনা[illegible]

কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। সে দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া সরযূর শয়নকক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সন্ধ্যার দীপ জ্বালিয়া সরযূ বসিয়া ছিল। স্বামীকে আসিতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখে ভয় বা উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নাই, যেন একফোঁটা রক্তও নাই। চন্দ্রনাথ একেবারেই বলিলেন, সব শুনেছ ?

সরযূ মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ!

সব সত্য ?

সত্য।

চন্দ্রনাথ শয্যার উপর বসিয়া পড়িলেন—এত দিন বল নি কেন ?

মা বারণ করেছিলেন, তুমিও জিজ্ঞাসা কর নি।

তোমার মায়ের উপকার করেছিলাম, তাই তোমরা এইরূপে শোধ দিলে!

সরযূ অধোমুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

চন্দ্রনাথ পুনরায় কহিলেন, এখন দেখ্‌চি কেন তুমি অত ভয়ে ভয়ে থাক্‌তে, এখন বুঝচি এত ভালবেসেও কেন সুখ পাই নি, পূর্ব্বের সব কথাই এখন স্পষ্ট হয়েচে। এই জন্যই বুঝি তোমার মা কিছুতেই এখানে আস্‌তে স্বীকার করেন নি ?

সরযূ মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

মুহূর্ত্তের মধ্যে চন্দ্রনাথ বিগত দিনের সমস্ত কথা স্মরণ করিলেন। সেই কাশীবাস, সেই চিরশুদ্ধ মূর্ত্তি সরযূর বিধবা মাতা,

সেই তাঁর কৃতজ্ঞ সজল চক্ষুদুটি, স্নিগ্ধ-শান্ত কথাগুলি, চন্দ্রনাথ সহসা আর্দ্র হইয়া বলিলেন, সরযূ, সব কথা আমাকে খুলে বলতে পার ?

পারি। আমার মামার বাড়ি নবদ্বীপের কাছে। রাখাল ভট্টাচার্য্যের বাড়ি আমার মামার বাড়ির কাছেই ছিল। ছেলেবেলা থেকেই মা তাঁকে ভালবাসতেন। দুজনের একবার বিয়ের কথাও হয় কিন্তু তাঁরা নিচ ঘর বলে বিয়ে হতে পায় নি। আমার বাবার বাড়ি হালিসহর। আমার যখন তিন বৎসর বয়স তখন বাবা মারা যান; মা আমাকে নিয়ে নবদ্বীপে ফিরে আসেন। তার পর আমার যখন পাঁচ বছর বয়স, সেই সময় আমাকে নিয়ে মা—

চন্দ্রনাথ বলিলেন, তার পরে ?

আমরা কিছুদিন মথুরায় থাকি, বৃন্দাবনে থাকি, তার পর কাশীতে আসি। এই সময়ে রাখাল মদ খেতে সুরু করে। মায়ের কিছু অলঙ্কার ছিল, তাই নিয়ে রোজ ঝগড়া হ'ত। তার পর একরাত্রে সমস্ত চুরি করে পালায়! সে সময় মায়ের হাতে একটি পয়সাও ছিল না। সাত-আট দিন আমরা ভিক্ষা করে কোনরূপে থাকি, তার পরে যা ঘটেছিল তুমি নিজেই জান।

চন্দ্রনাথের মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তিনি সরযূর আনত মুখের দিকে ক্রূর দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, ছি ছি সরযূ, তুমি এই! তোমরা এই! সমস্ত জেনে শুনে তুমি আমার এই সর্ব্বনাশ করলে ? এ যে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নে। কি মহা পাপিষ্ঠা তুমি!

সরযূর চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, সে নিঃশব্দে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

চন্দ্রনাথ তাহা দেখিতে পাইলেন না। অধিকতর কঠোর হইয়া বলিলেন, এখন উপায় ?

সরযূ চোখের জল মুছিয়া আস্তে আস্তে বলিল, তুমি বলে দাও।

তবে কাছে এস।

সরযূ কাছে আসিলে চন্দ্রনাথ দৃঢ়দৃষ্টিতে তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, লোকে তোমাকে ত্যাগ করতে বলে, কিন্তু আমার সে সাহস হয় না, তোমাকে বিশ্বাস হয় না, আমি সব বিশ্বাস হারিয়েচি।

মুহূর্ত্তের মধ্যে সরযূর বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে এক ঝলক রক্ত ছুটিয়া আসিল, অশ্রু-মলিন চোখ দুটি মুহূর্ত্তের জন্য চক্ চক্ করিয়া উঠিল, বলিল, আমাকে বিশ্বাস নেই ?

কিছু না, কিছু না, তুমি সব পার।

সরযূ স্বামীর মুখের কাছে মুখ আনিয়া অবিচলিত-কণ্ঠে কহিল, তুমি যে আমার কি তা তুমিও জান। একদিন তুমি আমাকে বলেছিলে, তোমার মুখের পানে চেয়ে দেখ্‌তে, আজ আমার মুখের পানে একবার চেয়ে দেখ। আজ আমি উপায় বলে দেব, বল শুন্‌বে ?

শুন্‌ব! দাও, বলে দাও কি উপায়!

সরযূ বলিল, আমি বিষ খেলে উপায় হয় কি ?

চন্দ্রনাথের মুষ্টি আরও দৃঢ় হইল। যেন পলাইয়া না পালাইতে পারে। কহিল, হয়, সরযূ হয়। বিষ খেতে পার্‌বে ?

পারব।
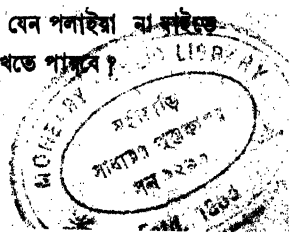
খুব সাবধানে, খুব গোপনে।

তাই হবে।

আজই।

সরযূ কহিল, আচ্ছা আজই। চন্দ্রনাথ চলিয়া যায় দেখিয়া সে স্বামীর পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, একটা আশীর্ব্বাদও কর্‌লে না?

চন্দ্রনাথ উপরদিকে চাহিয়া বলিল, এখন নয়। যখন চলে যাবে, যখন মৃতদেহ পুড়ে ছাই হবে, তখন আশীর্ব্বাদ কর্‌ব।

সরযূ পা ছাড়িয়া বলিল, তাই ক'রো।

চন্দ্রনাথ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই সে আর একবার উঠিয়া গিয়া দ্বারে পিঠ দিয়া পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমি বিষ খেলে কোন বিপদ তোমাকে স্পর্শ কর্‌বে না ত?

কিছু না।

কেউ কোন রকম সন্দেহ কর্‌বে না ত?

নিশ্চয় কর্‌বে। কিন্তু টাকা দিয়ে লোকের মুখ বন্ধ কর্‌ব।

সরযূ বলিল, বিছানার তলায় একখানা চিঠি লিখে রেখে যাব, সেইখানা দেখিও।

চন্দ্রনাথ কাছে আসিয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিল, তাই ক'রো। বেশ করে লিখে নিচে নিজের নাম স্পষ্ট করে লিখে রেখো, কেউ যেন না বুঝ্‌তে পারে, আমি তোমাকে খুন করেছি। আর একটা কথা, ঘরের দোর জানালা বেশ করে বন্ধ করে দিয়ো, একবিন্দু শব্দ যেন বাইরে না যায়। আমি যেন শুন্‌তে না পাই—

সরযূ হাত ছাড়িয়া দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া আর একবার প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তবে যাও, বলিয়াই তাহার কি যেন সন্দেহ হইল, হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, র'সো, আর একটু দাঁড়াও। সে প্রদীপ কাছে আনিয়া স্বামীর মুখের দিকে বেশ করিয়া চাহিয়া দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। চন্দ্রনাথের দুই চোখে একটা অমানুষিক তীব্র দ্যুতি—ক্ষিপ্তের দৃষ্টির মত তাহা ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল।

চন্দ্রনাথ বলিল, চোখে কি দেখ্‌ছ সরযূ!

সরযূ এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কিছু না। আচ্ছা যাও।

চন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল, বিড় বিড় করিয়া বলিতে বলিতে গেল, সেই ভাল—সেই ভাল—আজই।

দশম পরিচ্ছেদ

সেই রাত্রে সরযূ নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া মনে মনে কহিল, আমি থেতে কিছুতেই পারব না। একা হলে মরতে পারতাম কিন্তু আমি ত আর একা নই—আমি যে মা। মা হয়ে সন্তান বধ করব কেমন করে। তাই সে মরিতে পারিল না। কিন্তু তাহার সুখের দিন যে নিঃশেষ হইয়াছে, তাহাতেও তাহার লেশমাত্র সংশয় ছিল না।

দ্বিতীয় রাত্রে চন্দ্রনাথ সহসা তাহার স্ত্রীর ঘরের মধ্যে আসিয়া

প্রবেশ করিল এবং সমস্ত শুনিয়া উন্মত্ত-আবেগে তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া স্থির হইয়া রহিল। অস্ফুটে বারম্বার কহিতে লাগিল, এমন কাজ কখনো ক'রো না সরযূ, কখনো না। কিন্তু ইহার অধিক সে ত আর কোন ভরসাই দিতে পারিল না। তাহার এই বৃহৎ ভবনে এই হতভাগিনীর জন্য এতটুকু কোণের সন্ধানও ত সে খুঁজিয়া পাইল না, যেখানে সরযূ তাহার লজ্জাহত পাংশু মুখখানি লুকাইয়া রাখিতে পারে। সমস্ত গ্রামের মধ্যে কোথাও এক বিন্দু মমতাও সে কল্পনা করিতে পারিল না, যাহার আশ্রয়ে সে তপ্ত অশ্রুরাশির একটি কণাও মুছিতে পারে। কাঁদিয়া কাটিয়া সে সাত দিনের সময় ভিক্ষা করিয়া লইয়াছে। ভাদ্রমাসের এই শেষ সাতটি দিন সে স্বামীর আশ্রয়ে থাকিয়া চিরদিনের মত নিরাশ্রিতা পথের ভিখারিণী হইতে যাইবে। ভাদ্রমাসে ঘরের কুকুর বিড়াল তাড়াইতে নাই—গৃহস্থের অকল্যাণ হয়, তাই সরযূর এই আবেদন গ্রাহ্য হইয়াছে।

একদিন সে স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল, আমার দুরদৃষ্ট আমি ভোগ করব, সে জন্য তুমি দুঃখ ক'রো না। আমার মত দুর্ভাগিনীকে ঘরে এনে অনেক সহ্য করেছ আর ক'রো না। বিদায় দিয়ে আবার সংসারী হও, আমার এমন সংসার যেন ভেঙ্গে ফেলো না।

চন্দ্রনাথ হেঁটমুখে নিরুত্তর হইয়া থাকে। ভাল মন্দ [illegible] জবাবই খুঁজিয়া পায় না। তবে এই কথাটা তাহার মনে [illegible] আজ কাল সরযূ যেন মুখরা হইয়াছে। বেশি [illegible] কহিতেছে। এতদিন তাহার মনের মধ্যে যে ভয়টা [illegible] এখন

তাহা নাই। দুদিন পূর্ব্বেও সে মুখ ঢাকিয়া, মুখোস পরিয়া এ সংসারে বাস করিতেছিল; তখন সামান্য বাতাসেও ভয় পাইত, পাছে তাহার ছদ্ম আবরণ খসিয়া পড়ে। পাছে তাহার সত্য পরিচয় জানাজানি হইয়া যায়। এখন তাহার সে ভয় গিয়াছে। তাই এখন নির্ভয়ে কথা কহিতেছে। এ জীবনে তাহার যাহা-কিছু ছিল, সেই স্বামী, তাহার সর্ব্বস্ব, সমাজের আদালত ডিক্রি জারি করিয়া নিলাম করিয়া লইয়াছে। এখন সে মুক্তঋণ, সর্ব্বস্বহীন সন্ন্যাসিনী। তাই সে স্বামীর সহিত স্বচ্ছন্দে কথা কহে, বন্ধুর মত, শিক্ষকের মত উপদেশ দিয়া নির্ভীক মতামত প্রকাশ করে। আর সে দিনের রাত্রে দুই জনেই দুই জনকে ক্ষমা করিয়াছে। চন্দ্রনাথ বিষ খাইতে প্রবৃত্ত করিয়াছিল, তাহার এ আত্মগ্লানি, শ্বশুর সব দোষ ঢাকিয়া দিয়াছে।

পরদিন প্রাতঃকাল হইতে হরকালী একখণ্ড [illegible] টিকিট কাটিয়া স্বামীকে দিয়া মাথামুণ্ড কত কি লিখাইতেছিল।

ব্রজকিশোর একবার জিজ্ঞাসা করিল, এত লিখে কি হবে?

হরকালী তাড়া দিয়া বলিল, তোমার যদি একটুকুও বুদ্ধি থাকতো তা হ'লে জিজ্ঞেস্ করতে না। একবার আমার কথা না শুনে এইটি ঘটিয়েছ, আর কোন বিষয়ে নিজের বুদ্ধি খাটাতে যেও না।

হরকালী যাহা বলিল, সুবোধ শিশুর মত ব্রজকিশোর তাহা লিখিয়া লইল। শেষ হইলে হরকালী স্বয়ং আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, ঠিক্ হয়েচে। নির্ব্বোধ ব্রজকিশোর চুপ করিয়া রহিল। অপরাহ্ণে হরকালী কাগজখানি হাতে লইয়া

সরযূর কাছে আসিয়া কহিলেন, বৌমা, এই কাগজখানিতে তোমার নামটী লিখে দাও।

কাগজ হাতে লইয়া সরযূ মুখপানে চাহিয়া কহিল, কেন মামিমা?

যা বলচি, তাই কর না বৌমা।

কিসে নাম লিখে দেব, তাও কি শুন্‌তে পাবো না?

হরকালী মুখখানা ভারী করিয়া কহিলেন, এটা বাছা তোমারই ভালর জন্যে। তুমি এখানে যখন থাকবে না, তখন কোথায় কি ভাবে থাকবে, তাও কিছু আমরা সন্ধান নিতে যাব না। তা বাছা, যেমন করেই থাক না কেন, মাসে মাসে পাঁচ টাকা করে খোরাকী পাবে। এ কি মন্দ?

ভাল মন্দ সরযূ বুঝিল। এবং এই হিতাকাঙ্ক্ষণার বুকের ভিতর যে কুটিলতা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহাও বুঝিল, কিন্তু যাহার প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা নদীগর্ভে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, সে আর খানকতক ইট কাঠ বাঁচাইবার জন্য নদীর সহিত কলহ করিতে চাহে না। সরযূ সেই কথা ভাবিল। তথাপি একবার হরকালীর মুখের পানে চাহিয়া দেখিল। সেই দৃষ্টি! যে দৃষ্টিকে হরকালী সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করিতেন, ভয় করিতেন, আজও তিনি এ চাহনি সহিতে পারিলেন না। চোখ নামাইয়া বলিলেন, বৌমা!

হাঁ মামিমা, লিখে দিই। সরযূ কলম লইয়া পরিষ্কার করিয়া নিজের নাম সই করিয়া দিল।

আজ ষোলই আশ্বিন—সরযূর চলিয়া যাইবার দিন। প্রাতঃকাল হইতে বড় বৃষ্টি পড়িতেছিল, হরকালী চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, পাছে যাওয়া না হয়।

সমস্ত দিন ধরিয়া সরযূ ঘরের দ্রব্য সামগ্রী গুছাইয়া রাখিতেছিল। মূল্যবান বস্ত্রাদি একে একে আলমারীতে বন্ধ করিল। সমস্ত অলঙ্কার লৌহসিন্দুকে পূরিয়া চাবি দিল, তাহার পর স্বামীকে ডাকিয়া আনিতে লোক পাঠাইয়া দিয়া নিজে ভূমিতলে পড়িয়া অনেক কান্না কাঁদিল। গৃহত্যাগের সময় যত নিকটে আসিতেছে, ক্লেশ তত অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। এই সাত দিন যে ভাবে কাটিয়াছিল আজ সে ভাবে কাটিবে বলিয়া মনে হইতেছে না। তাহার শঙ্কা হইল, পাছে এই শেষ দিনটিতে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে, যাইবার সময় পাছে নিতান্ত তাড়িত ভিক্ষুকের মত দেখিতে হয়। আত্ম-সম্মানটুকুকে সে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিয়াছিল, সেটুকুকে ত্যাগ করিতে কিছুতেই তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

চন্দ্রনাথ আসিলে সে চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিল। বলিল, এস, আজ আমার যাবার দিন। তখনও তাহার চক্ষুর পাতা আর্দ্র রহিয়াছে। চন্দ্রনাথ আর একদিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। সরযূ কাছে আসিয়া বলিল, এই চাবি নাও। যতদিন আর বিয়ে না কর, ততদিন অপর কাকেও দিও না।

চন্দ্রনাথ রুদ্ধস্বরে কহিল, যেখানে হয় রেখে দাও।

সরযূ হাত দিয়া টানিয়া চন্দ্রনাথের মুখ ফিরাইয়া ধরিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, কাঁদবার চেষ্টা কচ্চ ?

চন্দ্রনাথের মনে হইল কথাটা বড় শক্ত বলা হইয়াছে। সরযূ তখনই তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া আদর করিয়া বলিল, মনে করে দেখ কোনদিন একটা পরিহাস করি নি, তাই যাবার দিনে আজ একটা তামাসা করলাম, রাগ ক'রো না। তাহার পর কহিল, যা কিছু ছিল, সমস্ত বন্ধ করে আলমারীতে রেখে গেলাম, দেখো, মিছিমিছি আমার একটি জিনিষও যেন নষ্ট না হয়।

চন্দ্রনাথ চাহিয়া দেখিল নিরাভরণা সরযূর হাতে শুধু চার-পাঁচ গাছি কাঁচের চুড়ি ছাড়া আর কিছু নাই। সরযূর এ মূর্ত্তি তাহার দুই চোখে শূল বিদ্ধ করিল, কিন্তু কি বলিবে সে? আজ দুখানা অলঙ্কার পরিয়া যাইবার প্রস্তাব করিয়া কি করিয়া সে এই দেবীর প্রতিমূর্ত্তিটিকে অপমান করিবে! সরযূ গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইয়া বলিল, আমি যাচ্ছি বলে অনর্থক দুঃখ ক'রো না, এতে তোমার হাত নেই, আমি তা জানি। চন্দ্রনাথ এতক্ষণ পর্য্যন্ত সহ্য করিয়াছিল, আর পারিল না, ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে গাড়ীর সময়। ষ্টেশনে যাইতে হইবে। বৃষ্টি আসিয়াছে, বাটীর বৃদ্ধ সরকার দুই-এক খানি কাপড় গামোছায় বাঁধিয়া কোচ্‌ম্যানের কাছে গিয়া বসিল। সেই সীতা দেবীর কথা বোধ করি তাহার মনে পড়িয়াছিল, তাই চোখের জলও বড় প্রবল হইয়া গড়াইয়া পড়িতেছিল। চক্ষু মুছিয়া মনে মনে কহিল, ভগবান, আমি ভৃত্য, তাই আজ আমার এই শাস্তি।

যাইবার সময় সরযূ হরকালীর মনের ভাব বুঝিয়া ডাকিয়া

প্রণাম করিল। পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিল, মামিমা, বাক্সটা একবার দেখ। হরকালী অপ্রতিভ হইলেন—না না না, থাক; ততক্ষণে কিন্তু টিনের বাক্স উন্মোচিত হইয়া হরকালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। লোভ সম্বরণ করা অসম্ভব। বক্রদৃষ্টিতে তিনি দেখিলেন ভিতরে দুই-এক জোড়া সাধারণ বস্ত্র, দুই-তিনটা পুস্তক, কাগজে আবৃত দুইখানা ছবি, আরও দুই-একটা কি কি রহিয়াছে। সরযূ কহিল, শুধু এই আছে।

হরকালী ধীরে ধীরে সরিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সরযূ গাড়ীতে উঠিয়া বসিল, কোচ্‌ম্যান্ গাড়ী হাঁকাইয়া ফটক্ বাহিয়া দ্রুত ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল। দ্বিতলের জানালা খুলিয়া মণিশঙ্কর তাহা দেখিলেন। আজ তাহার মনে হইল বুঝি কাজটা ভাল হইল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সমস্ত রাত্রি মণিশঙ্কর ঘুমাইতে পারিলেন না। সারারাত্রি ধরিয়াই তাঁহার দুই কানের মধ্যে একটা ভারী গাড়ীর গভীর আওয়াজ গুম্ গুম্ শব্দ করিতে লাগিল। প্রত্যুষেই শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন, গেটের উপর একজন অপরিচিত লোক দীনবেশে অর্দ্ধ-সুপ্তাবস্থায় বসিয়া আছে। কাছে যাইতেই লোকটা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমি একজন পথিক। মণিশঙ্কর চলিয়া যাইতে ছিলেন, সে পিছন হইতে ডাকিল, মণিশঙ্করবাবুর বাড়ি কি এই?

তিনি ফিরিয়া বলিলেন, এই।

তাঁর সঙ্গে কখন্ দেখা হ'তে পারে, ব'লে দিতে পারেন?

আমারই নাম মণিশঙ্কর।

লোকটা সসম্ভ্রমে নমস্কার করিয়া বলিল, আপনার কাছেই এসেছি।

মণিশঙ্কর তাহার আপাদমস্তক বার বার নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, কাশী থেকে কি আসছ বাপু?

আজ্ঞে হাঁ।

দয়াল পাঠিয়েছে?

আজ্ঞে হাঁ।

টাকার জন্য এসেচ?

আজ্ঞে হাঁ।

মণিশঙ্কর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তবে আমার কাছে কেন? আমি টাকা দেব, তাই কি মনে করেচ?

লোকটি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না। দয়াল ঠাকুর ব'লে দিয়েচেন, আপনি টাকা পাবার সুবিধা ক'রে দিতে পারবেন।

মণিশঙ্কর ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, পারব। তবে ভেতরে এস।

দুইজনে নির্জ্জন-কক্ষে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিলেন। মণিশঙ্কর বলিলেন, সমস্ত তবে সত্য?

সমস্ত সত্য। বলিয়া সে কয়েকখানা পত্র বাহির করিয়া দিল। মণিশঙ্কর তাহা আগাগোড়া পাঠ করিয়া বলিলেন, তবে তোমার দোষ কি?

তার দোষ নেই, কিন্তু মায়ের দোষে মেয়েও দোষী হয়ে পড়েছে।

তবে যার নিজের দোষ নেই, তাকে কি জন্য বিপদ্‌গ্রস্ত কর্‌চ ?

আমারও উপায় নেই। টাকার জন্য সব করতে হয়।

মণিশঙ্কর কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, দেখ বাপু, এ দুর্নাম প্রকাশ পেলে আমারও অত্যন্ত লজ্জার কথা। চন্দ্রনাথ আমার ভ্রাতুষ্পুত্র!

রাখালদাস মাথা নাড়িয়া দৃঢ়ভাবে কহিল, আমি নিরুপায়।

সে কথা তোমার দিকে তাকালেই জানা যায়। ধর, টাকা যদি আমি নিজেই দিই, তাহলে কি রকম হয় ?

ভালই হয়! আর ক্লেশ স্বীকার ক'রে চন্দ্রনাথবাবুর নিকট যেতে হয় না।

টাকা পেলেই তুমি গ্রাম ছেড়ে চ'লে যাবে, আর কোন কথা প্রকাশ করবে না, এ নিশ্চয় ?

নিশ্চয়।

কত টাকা চাই ?

অন্ততঃ দুহাজার।

মণিশঙ্কর বাহিরে গিয়া নায়েব লক্ষ্মীনারাণকে ডাকিয়া দুই-তিনটি কথা বলিয়া দিলেন, তাহার পর ভিতরে আসিয়া একহাজার করিয়া দুইখানি নোট বাক্স খুলিয়া রাখালদাসের হাতে দিয়া বলিলেন, এখান থেকে দশ ক্রোশ দূরে সরকারী খাজনাঘর, সেখানে ভাঙিয়ে নিয়ো, আর কোথাও ভাঙান যাবে না। আর

কখনো এ দিকে এসো না। আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট নই, তাই আর যদি কখন এদিকে আসবার চেষ্টা কর, জীবিত ফিরতে পারবে না, তাও ব'লে দিলাম।

রাখালদাস চলিয়া গেল।

প্রাণপণে হাঁটিয়া অপরাহ্ণে সে সহরে উপস্থিত হইল। তখন কাছারি বন্ধ হইয়াছে। কোন কাজ হইল না। পরদিন যথা-সময়ে রাখালদাস খাজাঞ্চির নিকট দুইখানি হাজার টাকার নোট দিয়া কহিল, টাকা চাই।

খাজাঞ্চিবাবু নোট দুইখানি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া, 'বসো' [illegible]জন পুলিশের দারোগা সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া [illegible] রাখালকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, এই নোট্ চুরি হয়েছে। জমিদার মণিশঙ্করবাবুর লোক বল্‌চে কাল সকালে ভিক্ষার ছল ক'রে তাঁর ঘরে ঢুকে এই দুখানি নোট চুরি করেচে। নোটের নম্বর মিল্‌চে।

রাখালদাস কহিল, জমিদারবাবু নিজে দিয়েচেন।

খাজাঞ্চি কহিল, বেশ, হাকিমের কাছে ব'লো।

যথাসময়ে হাকিমের কাছে রাখাল বলিল, যাঁর টাকা, তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেই সমস্ত পরিষ্কার হবে। বিচারের দিন ডেপুটি আদালতে জমিদার মণিশঙ্কর উপস্থিত হইয়া হলফ্ লইয়া বলিলেন, তিনি লোকটাকে জীবনে কখনও দেখেন নাই। নোট্ তাঁহার বাক্সে ছিল, কাহাকেও দেন নাই। রাখাল নিজেকে বাঁচাইবার জন্য অনেক কথা কহিতে চাহিল, হাকিম তাহা কর্ণে [illegible]

লিখিয়া লইলেন, কতক বা মণিশঙ্করের উকিল-মোক্তার গোলমাল করিয়া দিল। মোটের উপর কথা কেহই বিশ্বাস করিল না, ডেপুটি তাহার দুই বৎসর সশ্রম কারাবাসের হুকুম করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

হরিদয়ালের বাটীতে পুরাতন দাসীটি পর্য্যন্ত নাই। বামুন-ঠাকরুণ ত সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ। সরযূ যখন প্রবেশ করিল তখন বাটীতে কেহ নাই, শূন্য বাটী হা হা করিতেছে। বৃদ্ধ সরকার কাঁদিয়া কহিল, মা, আমি তবে যাই?

সরযূ প্রণাম করিয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। সরকার কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিল, দয়াল ঠাকুরের আগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিল না, ইচ্ছাও ছিল না।

সন্ধ্যার সময় দয়াল বাটী আসিলেন। সরযূকে দালানে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, কে?

সরযূ প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মুখ তুলিয়া বলিল, আমি।

সরযূ! দয়াল বিস্মিত হইয়া মনোযোগ সহকারে দেখিলেন সরযূর গায়ে একখানি অলঙ্কার নাই, পরিধেয় বস্ত্র সামান্য, দাস দাসী কেহ সঙ্গে আসে নাই, অদূরে একটা বাক্সমাত্র পড়িয়া আছে। ব্যাপারটা সমস্ত বুঝিয়া লইয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, যা ভেবে-ছিলাম, ঠিক তাই হয়েচে। তাড়িয়ে দিয়েচে।

সরযূ মৌন হইয়া রহিল।
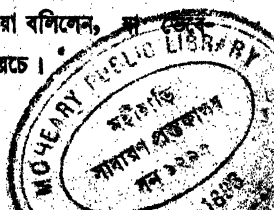
দয়াল ঠাকুর তখন অতিশয় কর্কশ-কণ্ঠে কহিলেন, এখানে তোমার স্থান হবে না। একবার আশ্রয় দিয়ে আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েচে, আর নয়।

সরযূ মাথা হেঁট করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মা কোথায়?

মাগী পালিয়েচে। আমাকে ডুবিয়ে দিয়ে স'রে পড়েচে, যেমন চরিত্র, সেইরূপ করেচে। রাগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া যাইতেছিল, হঠাৎ ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিল, বলা যায় না, হয় ত কোথাও খুব সুখেই আছে।

সেইখানে সরযূ বসিয়া পড়িল। সে যে অবশেষে তাহার মায়ের কাছেই ফিরিয়া আসিয়াছিল।

দয়াল বলিতে লাগিল, আমি তোমাকে স্থান দিয়ে জাত খোয়াতে চাই নে! যারা আদর ক'রে নিয়ে গিয়েছিল, শেষকালে তারা কি তোমার মাথা রাখবার একটু কুঁড়েও বেঁধে দিতে পারে নি, তাই রেখে গেছে আমার কাছে? যাও এখান থেকে।

এবার সরযূ কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, দাদামশাই, মা নেই, আমি যাব কোথায়?

হরিদয়ালের শরীরে আর মায়া-মমতা নাই। সে স্বচ্ছন্দে বলিল, কাশীর মত স্থানে তোমাদের স্থানাভাব হয় না। সুবিধামত একটা খুঁজে নিয়ো। সে নাকি বড় জ্বালায় জ্বলিতেছিল, তাই এমন কথাটাও কহিতে পারিল।

সরযূর স্বামী তাহাকে গৃহে স্থান দেয় নাই, হরিদয়াল দিবে কেন? ইহাতে তাহাকে দোষ দিবার কিছু নাই, সরযূ তা

বুঝিল। কিন্তু তাহারও যে আর দাঁড়াইবার স্থান নাই। স্বামীর গৃহে দুদিনের আদর-যত্নে অতিথির মত গিয়াছিল, এখন বিদায় হইয়া আসিয়াছে! এ সংসারে, সেই যত্ন-পরায়ণ গৃহস্থ আর ফিরিয়া দেখিবে না, অতিথিটি কোথায় গেল! বড় যাতনায় তাহার নীরব অশ্রু গণ্ড বহিয়া পড়িতেছিল। এই তাহার ষোল বছরের বয়স, তাহার সব সাধ ফুরাইয়াছে! মাতা নাই, পিতা নাই—স্বামী পরিত্যাগ করিয়াছে। দাঁড়াইবার স্থান নাই, আছে শুধু কলঙ্ক, লজ্জা আর বিপুল রূপযৌবন। এ নিয়ে বাঁচা চলে, কিন্তু সরযূর চলে না। সে ভাবিতেছিল, তাহার কত আয়ু, আর ক'দিন বাঁচিতে হইবে! যতদিন হউক, আজ তাহার নূতন জন্মদিন। যদিও দুঃখকষ্টের সহিত তাহার পূর্ব্বেই পরিচয় ঘটিয়াছে, কিন্তু এরূপ তীব্র অপমান এবং লাঞ্ছনা কবে সে ভোগ করিয়াছে? দয়াল ঠাকুর উত্তরোত্তর উত্তেজিত-কণ্ঠে কথা কহিতেছিলেন, এবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ব'সে রইলে যে?

সরযূ আকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাব?

আমি তার কি জানি?

সরযূ রুদ্ধ-কণ্ঠে বলিল, দাদামশাই, আজ রাত্রি—

দূর্ দূর্, একদণ্ডও না।

এবার সরযূ উঠিয়া দাঁড়াইল। চকিতে মনে একটু সাহস হইল, মনে করিল, যাহার কাছে শত অপরাধেও ভিক্ষা চাহিবার অধিকার ছিল, তাহার কাছেই যখন চাহি নাই, তখন পরের কাছে চাহিব কি জন্য? মনে মনে বলিল, আর কিছু না থাকে,

কাশীর গঙ্গা ত এখন শুকায় নাই—সে সমাজের ভয়ও করে না, তাহার জাতিও যায় না ; এ দুঃখের দিনে একটি দুঃখী মেয়েকে স্বচ্ছন্দে কোলে তুলিয়া লইবে। আমার আর কোথাও আশ্রয় না থাকে, সেখানে থাকিবেই। সরযূ চলিতে চাহিল ; কিন্তু চলিতে পারিল না, আবার বসিয়া পড়িল।

দয়াল ঠাকুর ভাবিল, এমন বিপদে সে জন্মে পড়ে নাই। তাহার গলাটা শুকাইয়া আসিতেছিল ; পাছে অবশেষে দমিয়া পড়ে, এই ভয়ে চীৎকার করিয়া কহিল, অপমান না হ'লে বুঝি যাবে না ? এই বেলা দূর হও—

এমন সময় সহসা বাহির হইতে ডাক আসিল, বাবাজী !

হরিদয়াল ব্যস্ত হইয়া উঠিল। ঐ বুঝি খুড়ো আসচে ! বলিতে বলিতেই কৈলাসচন্দ্র এক হাতে দাবার পুঁটুলি অপর হাতে হুঁকা লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তিনি যে এইমাত্র আসিয়াছিলেন, তাহা নহে ; গোলমাল শুনিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া হরিদয়ালের তিরস্কার ও গালিগালাজ শুনিতেছিলেন। তাই যখন ভিতরে প্রবেশ করিলেন, তখন হাতে দাবার পুঁটুলি ও হুঁকা ছিল, কিন্তু মুখে হাসি ছিল না। সোজা সরযূর কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, সরযূ যে ! কখন এলে মা ?

সরযূ কৈলাস খুড়োকে চিনিত, প্রণাম করিল।

তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন, এস মা, এস ! তোমার ছেলের বাড়িতে না গিয়ে এখানে কেন মা ? তাহার পর হুঁকা নামাইয়া রাখিয়া সরযূর টিনের বাক্সটা একেবারে কক্ষে তুলিয়া লইয়া বলিলেন,

চল মা, সন্ধ্যা হয়। কথাগুলি তিনি এরূপভাবে কহিলেন, যেন তাহাকে লইবার জন্যই আসিয়াছিলেন।

সরযূ কোন কথাই পরিষ্কার বুঝিতে পারিল না অধোমুখে বসিয়া রহিল।

কৈলাসচন্দ্র ব্যস্ত হইলেন, কহিলেন, তোর বুড়ো ছেলের বাড়ি যেতে লজ্জা কি? সেখানে কেউ তোকে অপমানের কথা বল্‌বে না, মা-ব্যাটায় মিলে নূতন ক'রে ঘরকন্না করব, চল্ মা, দেরি করিস্ নে।

সরযূ তথাপি উঠিতে পারিল না।

হরিদয়াল হাঁকিয়া বলিল, খুড়ো, কি করচো?

কিছু না বাবাজী। কিন্তু তখনই সরযুর খুব নিকটে আসিয়া হাতখানি প্রায় ধরিয়া ফেলিবার মত করিয়া নিতান্ত কাতরভাবে বলিলেন, চল্ না মা, ব'সে ব'সে কেন মিছে কটু কথা শুনচিস্?

সরযূ উঠিয়া দাঁড়াইল দেখিয়া হরিদয়াল কহিল, খুড়ো কি একে বাড়ি নিয়ে যাচ্চ?

খুড়ো জবাব দিল, না বাবা, রাস্তায় বসিয়ে দিতে যাচ্চি।

ব্যঙ্গোক্তি শুনিয়া হরিদয়াল বিরক্ত হইয়া বলিল, কিন্তু খুড়ো, কাজটি ভাল হচ্চে না। কাল কি হবে ভেবে দেখো।

[illegible]লাসচন্দ্র তাহার উত্তর দিলেন না, কিন্তু সরযূকে কহিলেন, [illegible]র চল্ মা, নইলে আবার হয় ত কি বল্‌বে।

[illegible]রযূ দরজার বাহিরে আসিয়া পড়িল। কৈলাসচন্দ্রও ঘাড়ে [illegible] লইয়া পশ্চাতে চলিলেন।

হরিদয়াল পিছন হইতে কহিলেন, খুড়ো শেষে কি জাতটা দেবে?

কৈলাসচন্দ্র না ফিরিয়াই বলিলেন, বাবাজী, তুমি নাও ত দিতে পারি।

আমাদের সঙ্গে তবে আহার ব্যবহার বন্ধ হ'ল।

কৈলাসচন্দ্র এবার ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, কবে কার বাড়িতে দয়াল, কৈলাস খুড়ো পাত পেতেছে?

তা না পাত, কিন্তু সাবধান ক'রে দিচ্চি।

কৈলাস ভ্রূ-কুঞ্চিত করিলেন। তাঁহার সুদীর্ঘ কাশীবাসের মধ্যে আজ তাঁহার এই প্রথম ক্রোধ দেখা দিল। বলিলেন, হরিদয়াল, আমি কি কাশীর পাণ্ডা, না যজমানের মন জুগিয়ে অন্নের সংস্থান করি? আমাকে ভয় দেখাচ্চ কেন? আর যা ভাল বুঝি, তাই চিরদিন করেচি, আজও তাই করব। সে জন্য তোমার দুর্ভাবনায় আবশ্যক নেই।

হরিদয়াল শুষ্ক হইয়া কহিল, তোমারই ভালর জন্য—

থাক্ বাবাজী! যদি এই পঁইষট্টি বছর তোমার পরামর্শ না নিয়েই কাটাতে পেরে থাকি, তখন বাকি দু-চার বছর পরামর্শ না নিলেও আমার কেটে যাবে। যাও বাবাজী, ঘরে যাও।

হরিদয়াল পিছাইয়া পড়িল।

কৈলাসচন্দ্র বাটীতে পৌঁছিয়া বাক্স নামাইয়া সহজভাবে বলিল, এ ঘর-বাড়ি সব তোমার মা, আমি তোমার ছেলে। বুড়োকে একটু আধটু দেখো, আর তোমার নিজের ঘরকন্না চালিয়ে নিয়ো, আর কি বলব?

কৈলাসের আর কোন কথা কহিবার ছিল কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু সরযূ বহুক্ষণ অবধি অশ্রু মুছিতে মুছিতে ভাবিয়া দেখিল, তাহার কোন কথাই আর বলিবার নাই।

সরযূ আশ্রয় পাইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শরৎকালে প্রাতঃ-সমীরণ যখন স্নিগ্ধ-মধুর সঞ্চরণে চন্দ্রনাথের কক্ষে প্রবেশ করিত, সারা রাত্রির দীর্ঘ জাগরণের পর চন্দ্রনাথ এই সময়টাতে ঘুমাইয়া পড়িত। তাহার পর তপ্ত সূর্য্য-রশ্মি জানালা দিয়া তাহার মুখের উপর, চোখের উপর পড়িত, চন্দ্রনাথের আবার ঘুম ভাঙিয়া যাইত! কিন্তু ঘুমের ঘোর কিছুতেই কাটিতে চাহিত না, পাতায় পাতায় জড়াইয়া থাকিত, তথাপি সে জোর করিয়া বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া পড়িত। সারা দিন কাজ-কর্ম্ম নাই, আমোদ নাই, উৎসাহ নাই, দুঃখ ক্লেশও প্রায় নাই; সুখের কামনা ত সে একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছে। শীর্ণ-কায়া নদীর উপর দিয়া সন্ধ্যার দীর্ঘ ভারবাহী তরণী যেমন করিয়া এপাশ ওপাশ করিয়া হেলিয়া দুলিয়া বাঁকিয়া চুরিয়া মন্থরগমনে স্বেচ্ছামত ভাসিয়া যায়, চন্দ্রনাথের ভাবী দিনগুলাও ঠিক্ তেমনি করিয়া এক সূর্য্যোদয় হইতে পুনঃ সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত ভাসিয়া যাইতে থাকে; সে নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছে, যে দিগন্ত প্রসারিত কাল মেঘ তাহার সুখের সূর্য্যকে জীবনের মধ্যাহ্নেই আচ্ছাদিত করিয়াছে এই মেঘের আড়ালেই একদিন সে সূর্য্য অস্তগমন করিবে। ইহ-জীবনে আর তাহার সাক্ষাৎ লাভ ঘটিবে না। তাহার নীরব,

নির্জ্জন কক্ষে এই নিরাশার কাল ছায়াই প্রতিদিন ঘন হইতে ঘনতর হইতে লাগিল, এবং তাহারই মাঝখানে বসিয়া চন্দ্রনাথ অলস-নিমীলিত চোখে দিন কাটাইতে লাগিল।

হরকালী বলেন, এই অগ্রহায়ণ মাসেই চন্দ্রনাথের আবার বিবাহ হইবে। চন্দ্রনাথ চুপ করিয়া থাকে। এই চুপ করিয়া থাকা সম্মতি বা অসম্মতির লক্ষণ, তাহা নির্ণয় করিতে স্বামীর সঙ্গে তাঁহার তর্ক-বিতর্ক হয়। মণিশঙ্করবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, চন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কিছু বলা যায় না।

এবার কার্ত্তিকমাসে দুর্গা-পূজা। মণিশঙ্করের ঠাকুর-দালান হইতে সানাইয়ের গান প্রাতঃকাল হইতেই গ্রামবাসীদের কানে কানে আগামী আনন্দের বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। চন্দ্রনাথের ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল। নিমীলিত-চক্ষে বিছানায় পড়িয়া শুনিতেছিল, একে একে কত কি সুর বাজিয়া যাইতেছে। কিন্তু তাহার একটা সুরও তাহার কাছে আনন্দের ভাষা বহিয়া আনিল না; বরঞ্চ ধীরে ধীরে হৃদয়-আকাশ গাঢ় কাল মেঘে ছাইয়া যাইতে লাগিল। আজ হঠাৎ তাহার মনে হইল এখানে আর ত থাকা যায় না; একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিল, আমার জিনিষপত্র গুছিয়ে নে, রাত্রের গাড়ীতে এলাহাবাদ যাব।

এ কথা হরকালী শুনিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিলেন, ব্রজকিশোর আসিয়া বুঝাইতে লাগিলেন, এমন কি মণিশঙ্কর নিজে আসিয়াও অনুরোধ করিলেন যে, আজ ষষ্ঠীর দিনে কোথাও গিয়া কাজ নাই।

চন্দ্রনাথ কাহারও কথা শুনিল না।

দুপুর-বেলা হরিবালা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সরযূ গিয়া অবধি এ বাটীতে তিনি আসেন নাই।

চন্দ্রনাথ তাঁহাকে দেখিয়া বলিল, হঠাৎ ঠান্‌দিদি কি মনে ক'রে?

ঠান্‌দিদি তাহার জবাব না দিয়া প্রশ্ন করিলেন, আজ কি বিদেশে যাচ্চ?

চন্দ্রনাথ বলিল, যাচ্চি।

পশ্চিমে যাবে?

যাব।

হরিবালা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, দাদা, কোথাও যাবে কি?

চন্দ্রনাথ হরিবালার অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিল, না। তাহ[illegible] অন্যমনস্কভাবে এটা ওটা নাড়িতে লাগিল।

হরিবালা যে কথা বলিতে আসিয়াছিলেন, তাহা ব[illegible] লজ্জাও করিতেছিল, সাহসও হইতেছিল না। কিন্তু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সাহস সঞ্চয় করিয়া লইয়া বলিয়া ফেলিলেন, দাদা, তার একটা উপায় কর্‌লে না? দুজনের দেখা অবধি দুজনেই মনে মনে তাহার কথাই ভাবিতেছিল, তাই এই সামান্য কথাটিতে দুজনের চক্ষেই জল আসিয়া পড়িল। চন্দ্রনাথ সামলাইয়া লইয়া [illegible] দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, উপায় আর কি কর্‌ব [illegible]

কাশীতে সে আছে কোথায়?

বোধ হয় তার মায়ের কাছে আছে।

তা আছে কিন্তু—
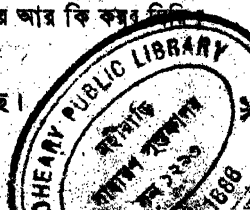
চন্দ্রনাথ মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কি ?

ঠান্‌দিদি ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া মৃদু-কণ্ঠে কহিলেন, রাগ ক'রো না দাদা—

চন্দ্রনাথ নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

ঠান্‌দিদি তেমনি মৃদু মিনতির স্বরে বলিলেন, কিছু টাকাকড়ি দিয়ো দাদা, আজ যেন সে একলা আছে, কিন্তু দুদিন পরে—

চন্দ্রনাথ কথাটা বুঝিয়াও বুঝিল না, বলিল, কি দুদিন পরে ?

বড় বড় দুফোঁটা চোখের জল হরিবালা চন্দ্রনাথের সম্মুখেই মুছিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, তার পেটে যা আছে ভালয় ভালয় তা যদি বেঁচে বর্ত্তে থাকে, তা হ'লে—

চন্দ্রনাথের আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল; তাড়াতাড়ি সে বলিয়া উঠিল, ঠান্‌দিদি, আজ বুঝি ষষ্ঠী।

হাঁ, ভাই।

আজ তা হ'লে—

যাবে না মনে কচ্চ ?

তাই ভাবচি।

তবে তাই কর। পূজার পর যেখানে হয় যেয়ো, এ কটা দিন বাড়িতেই থাক।

কি জানি কি ভাবিয়া চন্দ্রনাথ তাহাতেই সম্মত হইল।

বিজয়ার পর একদিন চন্দ্রনাথ গোমস্তাকে ডাকিয়া বলিল,

সরকারমশায়, কাশীতে তাকে রেখে আস্‌বার সময় হরিদয়াল কি কিছু ব'লে দিয়েছিলেন ?

সরকার কহিল, তাঁর সঙ্গে আমার ত দেখা হয় নি।

চন্দ্রনাথ ভয় পাইয়া কহিল, দেখা হয় নি ? তবে কার কাছে দিয়ে এলেন ? তার মায়ের সঙ্গে ত দেখা হ'য়েছিল ?

সরকার মাথা নাড়িয়া বলিল, আজ্ঞে না, বাড়িতে ত কেউ ছিল না।

কেউ ছিল না ? সে বাড়িতে কেউ থাকে কি না, সে সং[illegible]দ নিয়েছিলেন ত ? হরিদয়াল আর কোথাও উঠে যেতেও [illegible] পারে।

সরকার কহিল, সে সংবাদ নিয়েছিলাম। দ[illegible]ল ঘোষাল সেই বাড়িতে থাকতেন।

চন্দ্রনাথ নিশ্বাস ফেলিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকি[illegible] জি[illegible] করিল, এ পর্য্যন্ত কত টাকা পাঠিয়েছেন ?

[illegible]জ্ঞে টাকা-কড়ি ত কিছু পাঠাই নি।

[illegible]াঠান্ নি। চন্দ্রনাথ সবিস্ময়ে বেদনায় উৎকণ্ঠায় পা[illegible]ুবর্ণ হইয়া কহিল, কেন ?

সরকার লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া কহিল, মামাবাবু ব[illegible] টা[illegible] র হিসাবে কিছু পাঠালেই হবে।

[illegible]াব শুনিয়া চন্দ্রনাথ অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠিল।

পাঁচ টাকার হিসাবে ? কেন, টাকা কি মামাবাবুর ? আপনি প্রতি মাসে কাশীর ঠিকানায় পাঁচ শ টাকা ক'রে পাঠাবেন।

যে আজ্ঞে, বলিয়া সরকার স্তম্ভিত হইয়া ধীরে ধীরে সরিয়া গেল।

হরকালী এ কথা শুনিয়া চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন, সে পাগল হয়েচে। সরকারকে তলপ করিয়া অন্তরাল হইতে জোর করিয়া হাসিলেন। হাসির ছটা ও ঘটা বৃদ্ধ সরকার শুনিতেও পাইল, বুঝিতেও পারিল। হরকালী কহিলেন, সরকার-মশায়, কত টাকা পাঠাতে বলেচে ?

প্রতিমাসে পাঁচ শ টাকা।

ভিতর হইতে পুনর্ব্বার বিদ্রূপের হাসি শুনিয়া সরকার ব্যস্ত হইয়া পড়িল। হরকালী অনেক হাসিয়া পরিশেষে গম্ভীর হইলেন। ভিতর হইতে বলিলেন, আহা, বাছার রাগ হ'লে আর জ্ঞান থাকে না। সে পোড়া-কপালীর যেমন অদৃষ্ট! আমি পাঁচ টাকা করে দিতে বলেচি, তাই রেগে উঠেচে। বলে পাঁচ শ টাকা ক'রে দিও। বুঝলে সরকারমশাই, চন্দ্রনাথের ইচ্ছা নয় যে, এক পয়সাও দেওয়া হয়।

কথাটা কিন্তু সরকার মহাশয় প্রথমে তেমন বুঝিল না। কিন্তু মনে মনে যত হিসাব করিল, তত বোধ হইতে লাগিল, হরকালীর কথাটাই সত্য। যাহাকে বাড়ি হইতে বাহির করা হইয়াছে, তাহাকে কি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক অত টাকা দেয় ?

ভাবিয়া চিন্তিয়া সে বলিল, তা আপনি যা বলেন।

বল্‌ব আর কি! এই সামান্য কথাটা আর বুঝলেন না ?

সরকার মহাশয় অপ্রতিভ হইয়া বলিল, তাই হবে।

হাঁ তাই। আপনি কিন্তু পাঁচ টাকা হিসাবে পাঠাবেন। চন্দ্র না দেয়, আমার হিসাব থেকে পাঁচ টাকা পাঠাবেন।

হরকালী মাসিক পঞ্চাশ টাকা করিয়া নিজের 'হিসাবে হাত খরচ পাইতেন।

সরকার মহাশয় প্রস্থান করিবার সময় বলিল, তাই পাঠাব।

চন্দ্রনাথ বাড়ি নাই। এলাহাবাদে গিয়াছেন। সরকার মহাশয় তাঁহাকে পত্র লিখিয়া মতামত জানিবার ইচ্ছা করিল, কিন্তু পরে মনে হইল, এরূপ অসম্ভব কথা লইয়া অনর্থক তোলাপাড়া করিয়া নিজের বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিয়া লাভ নাই।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

উপরি-উক্ত ঘটনার পর দুই বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। এই দুই বৎসর আর কোন পরিবর্ত্তন হউক বা না হউক, কৈলাস খুড়োর জীবনে বড় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যেদিন তাঁহার কমলা চলিয়া গিয়াছিলেন, যেদিন তাঁহার কমলাচরণ সর্ব্বশেষ নিশ্বাসটী ত্যাগ করিয়া ইহজীবনের মত চক্ষু মুদিয়াছিল, সেই দিন হইতে বিশ্ব [illegible] বিশ্বও কৈলাসচন্দ্রের পক্ষে চক্ষু মুদিয়াছিল। কি সরযুর ওই ক্ষুদ্র শিশুটী তাঁহাকে পুনর্ব্বার সেই বিস্মৃত সংসারের স্নেহময় জটিল পথে ফিরাইয়া আনিয়াছে। সেদিন তাঁহার ক্ষুদ্র চক্ষু দুটি বহুদিন পরে আর একবার জলে ভরিয়া গিয়াছিল, চক্ষু মুছিয়া বলিয়াছিলেন, আমার ঘরে বিশ্বেশ্বর এসেছেন।

তখনও সে ছোট ছিল; বিশু বলিয়া ডাকিলে উত্তর দিতে পারিত না, শুধু চাহিয়া থাকিত। তখন সে সরযুর ক্রোড়ে,

লখীয়ার মায় ক্রোড়ে, এবং বিছানায় শুইয়া থাকিত; কিন্তু যেদিন হইতে সে তাহার চঞ্চল পা দুটি চৌকাঠের বাহিরে লইয়া যাইতে শিখিয়াছে, সেদিন হইতে সে বুঝিয়াছে, দুধের চেয়ে জল ভাল এবং দ্বিধাশূন্য হইয়া পরিষ্কার অপরিষ্কার সর্ব্ববিধ জলপাত্রেই মুখ ডুবাইয়া সরযূকে ফাঁকি দিয়া আকণ্ঠ জল খায় এবং যেদিন হইতে তাহার বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে তাহার শুভ্র, কোমল উদর এবং মুখের উপর কয়লা কিংবা ধূলার প্রলেপ দিতে পারিলেই দেহের শোভা বাড়ে, সেই দিন হইতে সে সরযূর কোল ছাড়িয়া মাটী এবং তথা হইতে কৈলাসচন্দ্রের স্থান করিয়া লইয়াছে। সকাল-বেলা কৈলাসচন্দ্র ডাকেন, বিশু, বিশু মুখ বাড়াইয়া বলে, দাদু; শম্ভু মিশিরকে এক বাজি দিয়ে আসি, সে অমনি দাবার পুঁটুলিটা হাতে লইয়া 'তল' বলিয়া দুই বাহু প্রসারিত করিয়া বৃদ্ধের গলা জড়াইয়া ধরে। কৈলাসচন্দ্রের আনন্দের সীমা থাকে না। সরযূকে ডাকিয়া বলেন, মা, বিশু আমার একদিন পাকা খেলোয়াড় হবে। সরযূ মুখ টিপিয়া হাসে, বিশু দাবার পুঁটুলি হাতে লইয়া বৃদ্ধের কোলে বসিয়া দাবা খেলিতে বাহির হয়। পথে যদি কেহ তামাসা করিয়া কহে, খুড়ো, বুড়ো বয়সে কি আরও দুটো হাত গজিয়েচে?

বৃদ্ধ একগাল হাসিয়া বলেন, বাবাজি, এ হাত দুটোতে আর জোর নেই, বড় শুক্‌নো হয়ে গেছে; তাই দুটো নূতন হাত বেরিয়েছে, যেন সংসারের গাছ থেকে প'ড়ে না যাই।

তাহারা সরিয়া যায়, বুড়োর কাছে কথায় পারিবার যো নেই। শম্ভু মিশিরের বাটিতে সতরঞ্চ খেলার মধ্যে শ্রীমান্ বিশ্বেশ্বরের

একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। দাদামহাশয়ের জানুর উপর বসিয়া, লাল রঙের কোঁচা ঝুলাইয়া, গম্ভীরভাবে চাহিয়া থাকে, যেন দরকার হইলেও সেও দুই-একটা চাল বলিয়া দিতে পারে।

হস্তি-দন্ত নির্ম্মিত বলগুলা যখন একটির পর একটি করিয়া তাহার দাদামহাশয়ের হস্তে নিহত হইতে থাকে, অতিশয় উৎসাহের সহিত বিশ্বেশ্বর সেগুলি হাতে লইয়া পেটের উপর চাপিয়া ধরে। কিন্তু লাল রঙের মন্ত্রীটার উপরেই তাহার ঝোঁকটা কিছু অধিক। সেটা যতক্ষণ হাতে না আসিয়া উপস্থিত হয় ততক্ষণ সে লোলুপ-দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া থাকে! মাঝে মাঝে তাগিদ দিয়া কহে, দাদু, ঐতে। কৈলাসচন্দ্র খেলার ঝোঁকে অন্যমনস্ক হইয়া কহেন, দাঁড়া দাদা, কখন হয় ত বা সে আশে-পাশে সরিয়া যায়, কৈলাসচন্দ্রের মনটিও চঞ্চলভাবে একবার বিশু ও একবার সতরঞ্চের উপর আনাগোনা করিতে থাকে, গোলমালে হয় ত বা একটা বল মারা পড়ে, কৈলাসচন্দ্র অমনি ফিরিয়া ডাকেন, দাদু, হেরে যাই যে—আয় আয়, ছুটে আয়। বিশ্বেশ্বর ছুটিয়া আসিয়া তাহার পূর্ব্বস্থান অধিকার করিয়া বসে, সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধেরও দ্বিগুণ উৎসাহ ফিরিয়া আসে। খেলা শেষ হইলে সে লাল মন্ত্রীটা হাতে লইয়া দাদামহাশয়ের কোলে উঠিয়া বাটি ফিরিয়া যায়।

কৈলাসচন্দ্রের এইরূপে নূতন দিনগুলা কাটে। পুরাতন বাঁধিসে [illegible] বাধা পড়িয়াছে! সাবেক দিনের মত দাবার পুঁটুলি [illegible] সময়ে তেমন যত্ন পায় না, হয় ত বা ঘরের কোণে একবেলা [illegible] থাকে; শম্ভু মিশিরের সহিত রোজ সকাল-বেলা হয় ত বা

দেখা-শুনা করিবার সুবিধা ঘটিয়া উঠে না। গঙ্গা পাঁড়ের দ্বিপ্রাহরিক খেলাটা ত একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সন্ধ্যার পর মুকুন্দ ঘোষের বৈঠকখানায় আর তেমন লোক জমে না, মুকুন্দ ঘোষ ডাকিয়া ডাকিয়া হার মানিয়াছে, কৈলাসচন্দ্রকে রাত্রে আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। সে সময়টায় তিনি নূতন শিষ্যটিকে খেলা শিখাইতে থাকেন; বলেন, বিশু, ঘোড়া আড়াই পা চলে।

বিশু গম্ভীরভাবে বলে, ঘোয়া—

হাঁ, ঘোড়া—

ঘোড়া চয়ে—ভাবটা এই যে, ঘোড়া চলে।

হাঁ, ঘোড়া চলে, আড়াই পা চলে।

বিশ্বেশ্বরের মনে নূতন ভাবোদয় হয়, বলে, গায়ী চয়ে—

কৈলাসচন্দ্র হতাশভাবে প্রতিবাদ করিয়া বলেন, না দাদা, এ ঘোড়া গাড়ি টানে না। সে ঘোড়া আলাদা।

সরযূ এ সময়ে নিকটে থাকিলে, পুত্রের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখিয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসিয়া চলিয়া যায়।

বিশু আঙ্গুল বাড়াইয়া বলে, ঐতে! অর্থাৎ সেই লালরঙের মন্ত্রীটা এখন চাই। বৃদ্ধ কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতেন না যে, এতগুলা দ্রব্য থাকিতে ঐ লাল মন্ত্রীটার উপরেই তাহার এত নজর কেন? প্রার্থনা কিন্তু অগ্রাহ্য হইবার যো নাই। বৃদ্ধ প্রথমে দুই একটা 'বোড়ে' হাতে দিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিতেন; বিশু বড় বিজ্ঞ, কিছুতেই ভুলিত না। তখন অনিচ্ছা সত্ত্বে তাহার ক্ষুদ্র হস্তে প্রার্থিত বস্তুটি তুলিয়া দিয়া বলিতেন, দেখিস্ দাদা, যেন হারায় না।

কেন ?

মন্ত্রী হারালে কি খেলা চলে ?

চলে না ?

কিছুতেই না।

বিশু গম্ভীর হইয়া বলিত, দাদু মন্‌ত্রি!

হাঁ দাদু—মন্ত্রী !
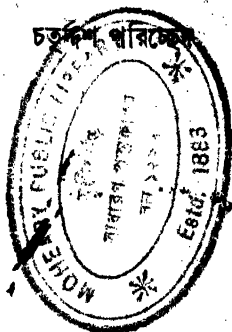
সে দিন ভোলানাথ চাটুয্যের বাটীতে কথা হইতেছিল। কৈলাসচন্দ্র ডাকিলেন, বিশু, চল দাদা, কথা শুনে আসি।

বিশ্বেশ্বর তখন লাল কাপড় পরিয়া জামা গায়ে দিয়া, টিপ পরিয়া, চুল আঁচড়াইয়া, দাদুর কোলে চড়িয়া কথা শুনিতে গেল। কথকঠাকুর রাজা ভরতের উপাখ্যান কহিতেছিলেন। করুণকণ্ঠে গাহিতেছিলেন, কেমন করিয়া সেই বনবাসী-মহাপুরুষের ক্রোড়ের নিকট হরিণ-শিশু ভাসিয়া আসিয়াছিল, কেমন করিয়া সেই সদ্যঃপ্রসূত মৃগ শাবক কাতর নয়নে আশ্রয় ভিক্ষা চাহিয়াছিল। আহা, রাজা ভরত নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এই সময় বিশু একটু সরিয়া বসিয়াছিল, কৈলাসচন্দ্র তাহাকে কোলের উপর টানিয়া লইলেন।

তাহার পর কথক গাহিলেন, সেই মৃগ-শিশু কেমন করিয়া পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে দিনে দিনে তাঁহার ছিন্ন স্নেহডোর আবার বাঁধিয়া তুলিতে লাগিল, কেমন করিয়া সেই শত-ভগ্ন মায়া-শৃঙ্খল তাঁহার চতুপার্শ্বে জড়াইয়া দিতে লাগিল, কেমন করিয়া সেই মৃগশিশু তাঁহার নিত্যকর্ম্ম পূজাপাঠ, এমন কি ঈশ্বর-চিন্তার মাঝে

আসিয়াও অংশ লইয়া যাইত! ধ্যান করিবার সময় মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইতেন, সেই নিরাশ্রয় পশু-শাবকের সজল করুণ দৃষ্টি তাঁহার পানে চাহিয়া আছে; তাহার পর সে বড় হইতে লাগিল। ক্রমে কুটির ছাড়িয়া প্রাঙ্গণে, প্রাঙ্গণ ছাড়িয়া পুষ্পকাননে, তাহার পর অরণ্যে, ক্রমে সুদূর অরণ্যপথে স্বেচ্ছামত বিচরণ করিয়া বেড়াইত। ফিরিয়া আসিবার নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রম হইলে রাজা ভরত উৎকণ্ঠিত হইতেন। সঘনে ডাকিতেন, আয়, আয়, আয়। তাহার পর কবি নিজে কাঁদিলেন, সকলকে কাঁদাইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গাহিলেন, কেমন করিয়া একদিন সে তাহার আজন্ম মায়া-বন্ধন নিমিষে ছিন্ন করিয়া চলিয়া গেল—বনের পশু বনে চলিয়া গেল, মানুষের ব্যথা বুঝিল না। বৃদ্ধ ভরত উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, 'আয়, আয়, আয়!' কেহ আসিল না, কেহ সে ব্যাকুল আহ্বানের উত্তর দিল না। তখন সমস্ত অরণ্য অন্বেষণ করিলেন, প্রতি কন্দরে কন্দরে, প্রতি বৃক্ষতলে, প্রতি লতাবিতানে কাঁদিয়া ডাকিলেন, 'আয়, আয়, আয়!' কেহ আসিল না। এক দিন, দুই দিন, তিন দিন কাটিয়া গেল, কেহ আসিল না। প্রথমে তাঁহার আহার-নিদ্রা বন্ধ হইল, পূজাপাঠ উঠিয়া গেল, তাহার পর ধ্যান, চিন্তা সব সেই নিরুদ্দেশ স্নেহাস্পদের পিছে পিছে অনুদ্দেশ বনপথে ছুটিয়া ফিরিতে লাগিল।

কবি গাহিলেন, মৃত্যুর কাল ছায়া ভূলুণ্ঠিত ভরতের অঙ্গ অধিকার করিয়াছে, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়াছে, তথাপি তৃষিত ওষ্ঠ ধীরে ধীরে কাঁপিয়া উঠিতেছে। যেন এখনও ডাকিতেছে, 'ফিরে আয়, ফিরে আয়, ফিরে আয়!'

কৈলাসচন্দ্র বিশ্বেশ্বরকে সবলে বক্ষে চাপিয়া হাহা রবে কাঁদিয়া উঠিলেন। অন্তরের অন্তর কাঁপিয়া কাঁপিয়া কাঁদিয়া উঠিল, 'আয়, আয়, আয়!'

সভায় কেহই বৃদ্ধের এ ক্রন্দন অস্বাভাবিক মনে করিল না। কারণ বয়সের সহিত সকলেরই কেহ না কেহ হারাইয়া গিয়াছে, সকলেরই হৃদয় কাঁদিয়া ডাকিতেছে, 'ফিরে আয়, ফিরে আয়, ফিরে আয়!'

কৈলাসচন্দ্র চক্ষু মুছিয়া বিশ্বেশ্বরকে ক্রোড়ে তুলিয়া বলিলেন, চল দাদা, বাড়ি যাই, রাত্তির হয়েচে।

বিশু কোলে উঠিয়া বাড়ি চলিল। অনেকক্ষণ একস্থানে বসিয়া থাকিয়া তাহার ঘুম পাইয়াছিল, পথিমধ্যে ঘুমাইয়া পড়িল।

বাড়ি গিয়া কৈলাসচন্দ্র সরযূর নিকট তাহাকে নামাইয়া দিয়া বলিলেন, নে মা, তোর জিনিস তোর কাছে থাক।

সরযূ দেখিল, বুড়োর চক্ষু দুটি আজ বড় ভারী হইয়াছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

এই দুই বৎসরের মধ্যে চন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার বাটীর সম্বন্ধই ছিল না। শুধু অর্থের প্রয়োজন হইলে সরকারকে পত্র লিখিতেন, সরকার লিখিত ঠিকানায় টাকা পাঠাইয়া দিতেন।

দুঃখ করিয়া হরকালী মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিতেন। ব্রজকিশোর ফিরিয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া চিঠি দিতেন। মণিশঙ্করও দুই-এক খানা পত্র লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার শারীরিক অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইয়া আসিতেছে, এ সময় একবার দেখিবার ইচ্ছা করে।

প্রথমে চন্দ্রনাথ সে সকল কথায় কর্ণপাত করিতেন না, কিন্তু যেদিন হরিবালা লিখিলেন, তুমি সুবিধা পাইলে একবার আসিয়ো, কিছু বলিবার আছে, সেদিন চন্দ্রনাথ তল্পি বাঁধিয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

হরিবালা যদি কিছু কহে, যদি কোন পত্র, যদি কোন হস্তলিপি দেখাইতে পারে, যদি সেই বিগত সুখের একটু আভাস তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়—তাহা হইলে—কিছু নয়। তথাপি চন্দ্রনাথ বাটী অভিমুখে ছুটিয়া আসিতে চাহিল। কিন্তু এতখানি পথ যে আশায় ভর করিয়া ছুটিয়া আসিল, বাটীতে আসিয়া তাহার কিছুই মিলিল না। হরিবালার সহিত সাক্ষাৎ হইলে জিজ্ঞাসা করিল, ঠান্‌দিদি, আর কিছু বল্‌বে না?

না, আর কিছু না।

নিরাশ হইয়া চন্দ্রনাথ কহিল, 'তবে কেন মিথ্যে ক্লেশ দিয়ে ফিরিয়ে আন্‌লে ?

বাড়ি না এলে কি ভাল দেখায় ? তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, দাদা, যা হবার হয়েছে, এখন তুমি সংসারী না হ'লে আমাদের দুঃখ রাখ্‌বার স্থান থাকবে না।

চন্দ্রনাথ বিরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, তা আমি কি কর্‌ব ?

কিন্তু মণিশঙ্কর কিছুতেই ছাড়িলেন না। হাত ধরিয়া বলিলেন, বাবা, আমাকে মাপ কর। সেই দিন থেকে যে জ্বালায় জ্বলে যাচ্চি তা শুধু অন্তর্যামীই জানেন।

চন্দ্রনাথ বিপন্ন হইল, কিন্তু কথা কহিতে পারিল না।

মণিশঙ্কর পুনরপি বলিতে লাগিলেন, আবার বিবাহ করে সংসার-ধর্ম্ম পালন কর। আমি তোমার মনোমত পাত্রী অন্বেষণ করে রেখেচি, শুধু তোমার অভিপ্রায় জানবার অপেক্ষায় এখনও কথা দিই নি। বাবা, এক সংসার গত হ'লে লোকে কি দ্বিতীয় সংসার করে না ?

চন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে কহিল, এক সংসার গত হয়েচে, সে সংবাদ পেলে পারি।

দুর্গা, দুর্গা, এমন কথা বল্‌তে নেই বাবা।

চন্দ্রনাথ চুপ করিয়া রহিল।

মণিশঙ্কর হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, আমার মনে হয়, আমিই তোমাকে সংসার-ত্যাগী করিয়েচি। এ দুঃখ আমার মরলেও যাবে না।

চন্দ্রনাথ বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, কোথায় সম্বন্ধ স্থির করেছেন?

মণিশঙ্কর চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, কলকাতায়; তুমি একবার নিজে দেখে এলেই হয়।

চন্দ্রনাথ কহিল, তবে কালই যাব।

মণিশঙ্কর আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, তাই কর। যদি পছন্দ হয় আমাকে পত্র লিখো, আমি বাটীর সকলকে নিয়ে একেবারে কলকাতায় উপস্থিত হব। কিছুক্ষণ থামিয়া বলিলেন, আমার আর বেশি দিন বাঁচবার সাধ নেই চন্দ্রনাথ, তোমাকে সংসারী এবং সুখী দেখলেই স্বচ্ছন্দে যেতে পারব!

পরদিন চন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিল। সঙ্গে মাতুল ব্রজকিশোরও আসিয়াছিলেন, কন্যা দেখা শেষ হইলে, ব্রজকিশোর বলিলেন, কন্যাটি দেখতে মা লক্ষ্মীর মত।

চন্দ্রনাথ মুখ ফিরাইয়া রহিল, কোনও মতামত প্রকাশ করিল না।

ষ্টেশনে আসিয়া টিকিট লইয়া দুইজনে গাড়িতে উঠিলে, ব্রজকিশোর জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে বাবাজী, পছন্দ হয়েছে ত?

চন্দ্রনাথ মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

ব্রজকিশোর যেন আকাশ হইতে পড়িলেন—এমন মেয়ে তবু পছন্দ হ'ল না?

চন্দ্রনাথ মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

ব্রজকিশোর মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, তিনি সরযূকে দেখেন নাই।

তাহার পর নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশনে ট্রেন থামিলে ব্রজকিশোর নামিয়া পড়িলেন, চন্দ্রনাথ এলাহাবাদের টিকিট লইয়াছিলেন।

ব্রজকিশোর বলিলেন, তবে কতদিনে ফিরবে?

কাকাকে প্রণাম জানিয়ে বল্‌বেন, শিগ্র ফেরবার ইচ্ছা নেই।

মণিশঙ্কর সে কথা শুনিয়া কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, যা হয় হবে। আমার দেহটা একটু ভাল হ'লেই নিজে গিয়ে বৌমাকে ফিরিয়ে আন্‌ব। মিথ্যা সমাজের ভয় ক'রে চিরকাল নরকে পচ্‌তে পার্‌ব না—আর সমাজই বা কে? সে ত আমি নিজে।

হরকালী এ সংবাদ শুনিয়া দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিল, মরবার আগে মিনসের বায়াত্তুরে ধরেচে। সরকারকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, চন্দ্রনাথ কি বললে?

সরকার কহিল, আজ পর্য্যন্ত কত টাকা কাশীতে পাঠানো হয়েচে?

শুধু এই জিজ্ঞেস করেছিল, আর কিছু না?

হরকালী মুখের ভাব অতি ভীষণ করিয়া চলিয়া গেল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

চন্দ্রনাথ এলাহাবাদের টিকিট কিনিয়াছিল, কিন্তু পথিমধ্যে অকস্মাৎ সঙ্কল্প পরিবর্ত্তন করিয়া কাশী আসিয়া উপস্থিত হইল।

সঙ্গে যে দুইজন ভৃত্য ছিল, তাহারা গাড়ি ঠিক করিয়া জিনিষপত্র তুলিল ; কিন্তু চন্দ্রনাথ তাহাতে উঠিল না ; উহাদিগকে ডাক-বাংলায় অপেক্ষা করিয়া থাকিবার হুকুম দিয়া পদব্রজে অন্য পথে চলিয়া গেল। পথে চলিতে তাহার ক্লেশ বোধ হইতেছিল। মুখ শুষ্ক, বিবর্ণ, নিজের প্রতি পদক্ষেপ নিজের বুকের উপরেই যেন পদাঘাতের মত বাজিতে লাগিল, তথাপি চন্দ্রনাথ চলিতে লাগিল, থামিতে পারিল না। ক্রমেই হরিদয়ালের বাটীর দূরত্ব কমিয়া আসিতেছে। এ সমস্তই যে তাহার বিশেষ পরিচিত পথ! গলির মোড়ের সেই ছোট চেনা দোকানটি—ঠিক্‌ তেমনি রহিয়াছে। দোকানের মালিক ঠিক্‌ তত বড় ভুঁড়িটি লইয়াই মোড়ার উপর বসিয়া ফুলুরি ভাজিতেছে। চন্দ্রনাথ একবার দাঁড়াইল, দোকানদার চাহিয়া দেখিল, কিন্তু সাহেবী-পোষাক-পরা লোকটিকে সাহস করিয়া ফুলুরি কিনিতে অনুরোধ করিতে পারিল না, একবার চাহিয়াই সে নিজের কাজে মন দিল।

চন্দ্রনাথ চলিয়া গেল। এই মোড়ের শেষে আর ত তাহার পা চলে না। সঙ্কীর্ণ কাশীর পথে যেন বিন্দুমাত্র বাতাস নাই, শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্লেশ হইতেছে, দুই-এক পা গিয়াই সে দাঁড়ায়,

আবার চলে, আবার দাঁড়ায়, পথ আর ফুরায় না, তথাপি মনে হয়, এ পথ যেন না ফুরায়! পথের শেষে না জানি কিবা দেখিতে হয়! তার পর হরিদয়ালের বাটীর সম্মুখে আসিয়া সে দাঁড়াইল। বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, ডাকিতে চাহিল, কিন্তু গলা শুকাইয়া গিয়াছে। বদ্ধ স্বর ভগ্ন শব্দ করিয়া থামিয়া গেল। ঘড়ি খুলিয়া দেখিল, নয়টা বাজিয়া গিয়াছে, তখন সাহস করিয়া ডাকিল, ঠাকুর, দয়াল ঠাকুর! কেহ উত্তর দিল না। পথ দিয়া যাহারা চলিয়া যাইতেছিল, অনেকেই চন্দ্রনাথের রীতিমত সাহেবী-পোষাক দেখিয়া ফিরিয়া চাহিল। চন্দ্রনাথ আবার ডাকিল, দয়াল ঠাকুর!

এবার ভিতর হইতে স্ত্রী-কণ্ঠে উত্তর আসিল, ঠাকুর বাড়ি নেই।

যে উত্তর দিল, সে একজন বাঙ্গালী দাসী।

সে দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া চন্দ্রনাথের পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া লুকাইয়া পড়িল, কিন্তু মাতৃভাষায় কথা কহিতে শুনিয়া একেবারে ভয়ে অভিভূত হইয়া পলাইয়া গেল না। অন্তরাল হইতে বলিল, ঠাকুর বাড়ি নেই।

কখন্ আসবেন?

দুপুর-বেলা।

চন্দ্রনাথ ভিতরে প্রবেশ করিল। আনন্দ, শঙ্কা ও লজ্জা তিনের সংমিশ্রণে বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল—ভিতরে সরযূ আছে। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিয়া আর কাহাকেও দেখিতে পাইল না। জিজ্ঞাসা করিল, বাড়িতে কি আর কেউ নেই?

না।

তারা কোথা?

কারা?
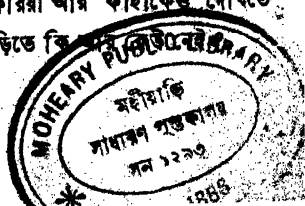
একজন স্ত্রীলোক—

এই আমি ছাড়া আর ত এখানে কেউ নাই।

একটি ছোট ছেলে?

না, কেউ না।

চন্দ্রনাথ পইঠার উপরে বসিয়া পড়িল, কহিল, এরা তবে গেল কোথায়?

দাসী বিব্রত হইয়া পড়িল। বলিল, না গো, এখানে কেউ থাকে না। আমি আর ঠাকুরমশাই থাকি। এক মাসের মধ্যে কোন যজমানও আসে নি।

চন্দ্রনাথ স্তব্ধ হইয়া মাটীর দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। মনে যে সব কথা উঠিতেছিল, তাহা অন্তর্যামীই জানেন। বহুক্ষণ পরে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কত দিন এখানে আছ?

প্রায় দেড় বছর।

তবুও কাউকে দেখ নি? একজন গৌরবর্ণ স্ত্রীলোক, আর একটি ছেলে না হয় মেয়ে, না হয় শুধু ঐ স্ত্রীলোকটি, কেউ না, কাউকে দেখ নি?

না, আমি কাউকে দেখি নি?

কারো মুখে কোন কথা শোন নি?

না।

চন্দ্রনাথ আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। সেইখানে

দয়াল ঠাকুরের অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার সেই সরযূ আর বাঁচিয়া নাই, তাহা সে বেশ বুঝিতেছিল, তথাপি শুনিয়া যাওয়া উচিত, এই জন্যই বসিয়া রহিল। এক একটি মিনিট্ এক একটি বৎসর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইলে হরিদয়াল ঠাকুর বাটী আসিলেন। প্রথম দৃষ্টিতে তিনি চমকিত হইলেন, পরে চিনিতে পারিয়া শুষ্কস্বরে কহিলেন, তাই ত, চন্দ্রবাবু যে, কখন এলেন ?

চন্দ্রনাথ ভগ্নকণ্ঠে কহিল, অনেকক্ষণ, এরা কোথায় ?

হাঁ এরা, তা এরা—

চন্দ্রনাথ টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কবে শেষ হ'ল ?

কি শেষ হ'ল ?

চন্দ্রনাথ শুষ্ক ভগ্ন-কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল, সরযূ কবে মরেছে ঠাকুর ?

ঠাকুর এবার বুঝিয়া বলিল, মরবে কেন, ভালই আছে।

কোথায় আছে ?

কৈলাস খুড়োর বাড়িতে।

সে কোথায় ?

[illegible]ীর শেষে। কাঁটালতলার বাড়িতে।

কপাল টিপিয়া ধরিয়া চন্দ্রনাথ পুনর্ব্বার বসিয়া পড়িল। বহুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর শান্ত-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, সে এখানে নেই কেন ?

দয়াল ঠাকুর ভাবিল, মন্দ নয়; এবং মিথ্যা লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই ভাবিয়া সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল, আপনি যাকে বাড়িতে জায়গা দিতে পারলেন না, আমি দেব কি ব'লে? আমারও ত পাঁচজনকে নিয়েই কাজ?

চন্দ্রনাথ বুঝিল, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। একটু ভাবিয়া বলিল, কৈলাস খুড়োর বাড়িতে কেমন ক'রে গেল?

তিনি নিজে নিয়ে গেছেন।

কে তিনি?

কাশীবাসী একজন দুঃখী ব্রাহ্মণ।

সরযূ তাঁকে আগে থেকেই চিন্‌ত কি?

হাঁ খুব চিন্‌ত।

তাঁর বয়স কত?

বুড়া হরিদয়াল মনে মনে হাসিয়া বলিল, তাঁর বয়স বোধ হয় ষাট বাষট্টি হবে! সরযূকে মা ব'লে ডাকেন।

সেখানে আর কে আছে?

একজন দাসী, সরযূ, আর বিশু।

বিশু কে?

সরযূর ছেলে।

চন্দ্রনাথ দাঁড়াইয়া বলিল, যাই।

হরিদয়াল গতিরোধ করিলেন না। চন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। গলির শেষে আসিয়া একজনকে জিজ্ঞাসা করিল, কৈলাশ খুড়োর বাড়ি কোথায় জান? সে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া

দেখাইয়া দিল। চন্দ্রনাথ একেবারে ভিতরে প্রবেশ করিল। সম্মুখে কাহাকেও দেখিতে পাইল না, শুধু সুন্দর হৃষ্ট-পুষ্ট-দেহ একটি শিশু ঘরের বারান্দায় বসিয়া একথালা জল লইয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিতেছিল এবং মাঝে মাঝে পরম পরিতোষের সহিত দেখিতেছিল, তাহার কচি মুখখানির কাল ছায়া কেমন করিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া তাহার সহিত সহাস্যে পরিহাস করিতেছিল। চন্দ্রনাথ তাহাকে একেবারে বুকে তুলিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। শিশু বিস্ময় বা ভয়ের চিহ্ন প্রকাশ করিল না। দেখিলে বোধ হয়, অপরিচিত লোকের ক্রোড়ে যাওয়া তাহার কাছে নূতন নহে। সে চন্দ্রনাথের নাকের উপর কচি হাতখানি রাখিয়া, মুখপানে চাহিয়া বলিল, তুমি কে?

চন্দ্রনাথ গভীর স্নেহে তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিল, আমি বাবা।

বাবা?

হাঁ বাবা, তুমি কে?

আমি বিশু!

চন্দ্রনাথ ঘড়ি-চেন বুক হইতে খুলিয়া লইয়া তাহার গলায় পরাইয়া দিল, পকেট হইতে ছুরি, পেন্সিল, মণিব্যাগ যাহা পাইল, তাহাই পুত্রের হস্তে গুঁজিয়া দিল; হাতের কাছে আর কিছুই খুঁজিয়া পাইল না যাহা পুত্র-হস্তে তুলিয়া দেওয়া যায়।

বিশু অনেকগুলি দ্রব্য হাতের মধ্যে পাইয়া পুলকিত হইয়া বলিল, বাবা!

চন্দ্রনাথ নিঃশব্দে তাহার ছোট মুখখানি নিজের মুখের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিল, বাবা।

এই সময়ে লখীয়ার মা বড় গোল করিল। সে হঠাৎ জানালার ভিতর দিয়া দেখিতে পাইল যে একজন সাহেব ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া বিশুকে কোলে লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সে নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া একেবারে রান্নাঘরে ছুটিয়া গেল। বাটীতে আজ কৈলাসচন্দ্র নাই, অনেক দিনের পর তিনি বিশ্বেশ্বরের পূজা দিতে গিয়াছিলেন; সরযূ এই কিছুক্ষণ হইল মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিয়া রন্ধন করিতে বসিয়াছিল। লখীয়ার মা সেইখানে ছুটিয়া গিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, মাইজী!

কি রে!

ঘরের ভেতরে স্লাহেব ঢুকে বিশুকে কোলে ক'রে ঘুরে বেড়াচ্চে।

সরযূ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, সে আবার কি? বলিয়া দ্বারের অন্তরাল হইতে দেখিতে চাহিল, দেখিতে পাইল না।

লখীয়ার মা তাহার বস্ত্র ধরিয়া টানিয়া বলিল, যেয়ো না, বাবুজী আসুন।

সরযূ তাহা শুনিল না, তাহার বিশ্বাস হয় নাই। অগ্রসর হইয়া যাহা দেখিল, তাহাতে বোধ হইল, দাসীর কথা অসত্য নহে, একজন সাহেবের মত কে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং অস্ফুটে বিশ্বেশ্বরের সহিত কথা কহিতেছে। সাহসে ভর করিয়া সে জানালার নিকটে গেল। যাহার ছায়া দেখিলে সে চিনিতে পারিত, তাহাকে চক্ষের নিমিষে চিনিতে পারিল—তাহার স্বামী—চন্দ্রনাথ!

ভিতরে প্রবেশ করিয়া, গলায় আঁচল্ দিয়া, পায়ের উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করিয়া সরযূ মুখ তুলিয়া দাঁড়াইল।

চন্দ্রনাথ বলিল, সরযূ!

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

তখন স্বামী-স্ত্রীতে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইল।

চন্দ্রনাথ বলিল, বড় রোগা হয়েচ।

সরযূ মুখপানে চাহিয়া অল্প হাসিল, যেন বলিতে চাহে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি! তাহার পর চন্দ্রনাথ বিশুকে লইয়া একটু অধিক পরিমাণে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। সরযূ তাঁহার জুতার ফিতা খুলিয়া দিল, গায়ের কোট, শার্ট একে একে খুলিয়া লইয়া বাতাস করিল, গামোছা ভিজাইয়া পা মুছাইয়া দিল। এ সকল কাজ সে এমন নিয়মিত শৃঙ্খলায় করিল, যেন ইহা তাহার নিত্যকর্ম্ম, প্রত্যহ এমনি করিয়া থাকে। যাঁহাকে এ জীবনে দেখিতে পাইবার আশামাত্র ছিল না, আজ অকস্মাৎ কতদিন পরে তিনি আসিয়াছেন, কত অশ্রু কত দীর্ঘনিশ্বাসের ছড়াছড়ি হইবার কথা ছিল। কিছু হইল না। সরযূ এমন ভাবটি প্রকাশ করিল, যেন স্বামী তাহার নিত্য আসিয়া থাকেন, আজিও আসিয়াছেন, হয় ত একটু বিলম্ব হইয়াছে, একটু বেলা হইয়াছে।

কিন্তু চন্দ্রনাথের ব্যবহারটি অন্য রকমের দেখাইতেছে। বিশুর সহিত ঘনিষ্ঠ আলাপ, যেন ঘরে আর কেহ নাই, বাড়াবাড়ি

বোধ হইতেছে। ঘরে ক্ষুদ্র-বুদ্ধি বিশ্বেশ্বর ভিন্ন আর কেহ ছিল না, থাকিলেও বুঝিতে পারিত যে চন্দ্রনাথ নিজে ধরা পড়িয়া গিয়াছে এবং সেইটুকু ঢাকিবার জন্তই প্রাণপণে মুখ ফিরাইয়া পুত্রকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সরযূ বলিল, খোকা, খেলা কর গে।

বিশু শয্যা হইতে নামিয়া পড়িতেছিল, চন্দ্রনাথ সযত্নে তাহাকে নামাইয়া দিল। ইতিপূর্ব্বে সে জননীকে প্রণাম করিতে দেখিয়াছিল, তাই নামিয়াই পিতার চরণ-প্রান্তে ঢিপ করিয়া প্রণাম করিয়া ছুটিয়া পলাইল। চন্দ্রনাথ হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেলেন, কিন্তু সে ততক্ষণ স্পর্শের বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছিল।

সরযূ তাহার বুকের কাছে হাত দিয়া কহিল, শরীরে যে তোমার কিছু নেই, অসুখ হয়েছিল?

না, অসুখ হয় নি।

তবে বড় বেশি ভাব্‌তে বুঝি?

চন্দ্রনাথ তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিল, তোমার কি মনে হয়?

সরযূ সে কথার উত্তর দিল না; অন্য কথা পাড়িল—বেলা হয়েচে, স্নান করবে চল।

চন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল, বাড়ির কর্ত্তা কোথায়?

তিনি আজ মন্দিরে পূজা করতে গেছেন, বোধ করি সন্ধ্যার পরে আস্‌বেন।

তুমি তাঁকে কি ব'লে ডাক?

বরাবর জ্যাঠামশায় বলে ডাকি, এখনও তাই বলি।

চন্দ্রনাথ আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না।

সরযূ জিজ্ঞাসা করিল, সঙ্গে কারা এসেছে ?

হরি আর মধু এসেচে। তারা ডাকবাংলায় আছে।

এখানে আন্‌তে বুঝি সাহস হ'ল না ?

চন্দ্রনাথ এ কথার উত্তর দিল না।

* * * *

চন্দ্রনাথ আহারে বসিয়া সুমুখের একথালা লুচি দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইল। অপ্রসন্ন ভাবে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, এ আবার কি ? কুটুম্বিতে করচো না তামাসা করচো ?

সরযূ অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। মলিন-মুখে বলিল, খাবে না ?

চন্দ্রনাথ ক্ষণকাল সরযূর মুখপানে চাহিয়া বলিল, দুপুর-বেলা কি আমি লুচি খাই ?

সরযূ মনে মনে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া মৌন হইয়া রহিল।

চন্দ্রনাথ কহিল, আজ যে তুমি আমাকে প্রথম খেতে দিলে, তা নয় ; আমি কি খাই, তাও বোধ করি ভুলে যাও নি ?

সরযূর চোখে জল আসিতেছিল, ভাবিতেছিল, সেই দিন যে ফুরাইয়া গিয়াছে—কহিল, ভাত খাবে ? কিন্তু—

কিন্তু কি ? শুকিয়ে গেছে ?

না, তা নয়—আমি এখানে রাঁধি।

বাড়িতেও ত রাঁধ্‌তে।
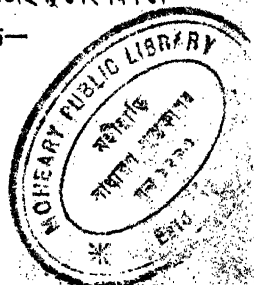
সরযূ একটু থামিয়া কহিল, আমার হাতে খাবে ত ?

এইবার চন্দ্রনাথ মুখ নত করিল। এতক্ষণ তাহার মনে হয় নাই যে, সরযূ পর হইয়া গিয়াছে, কিংবা তাহার স্পর্শিত অন্নব্যঞ্জন আহার করা যায় না। কিন্তু সরযূর কথার ভিতর বড় জ্বালা ছিল। বহুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল তাহার পর ধীরে ধীরে কহিল, সরযূ, দুপুর-বেলা আমার চোখে জল না দেখ্‌লে কি তোমার তৃপ্তি হবে না ? সরযূ তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল—যাই তবে আনি গে। রন্ধন-শালায় প্রবেশ করিয়া সে বড় কান্না কাঁদিল, তার পর চক্ষু মুছিল, জল দিয়া ধুইয়া ফেলিল, আবার অশ্রু আসে, আবার মুছিতে হয়, সরযূ আর আপনাকে কিছুতে সাম্‌লাইতে পারে না। কিন্তু স্বামী অভুক্ত বসিয়া আছেন, তখন অন্নের থালা লইয়া উপস্থিত হইল। কাছে বসিয়া বহুদিন পূর্ব্বের মত যত্ন করিয়া আহার করাইয়া, উচ্ছিষ্ট পাত্র হাতে লইয়া, আর একবার ভাল করিয়া কাঁদিবার জন্য রন্ধন-শালায় প্রবেশ করিল।

বেলা দুইটা বাজিয়াছে। চন্দ্রনাথের ক্রোড়ের কাছে বিশ্বেশ্বর পরম আরামে ঘুমাইয়াছে। সরযূ প্রবেশ করিল।

চন্দ্রনাথ কহিল, সমস্ত কাজকর্ম্ম সারা হ'ল ?

কাজ কিছুই ছিল না। জ্যাঠামশাই এখনও আসেন নি। তাহার পর সরযূ ঘর-কন্নার কথা পাড়িল। বাড়ির প্রতি ঘর, প্রতি সামগ্রী, মাতুল-মাতুলানী, দাস-দাসী, সরকারমশায়, হরিবালা সই, পাড়া-প্রতিবেশী একে একে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিল। এই সময়টুকুর মধ্যে দুজনের কাহারই মনে পড়িল না যে সরযূর এ

সব জানিয়া লাভ নাই, কিংবা এ সকল সংবাদ দিবার সময় চন্দ্রনাথেরও ক্লেশ হওয়া উচিত। একটু লজ্জা, একটু বিমর্ষতা, একটু সঙ্কোচের আবশ্যক। একজন পরম আনন্দে প্রশ্ন করিতেছে, অপরে উৎসাহের সহিত উত্তর দিতেছে। নিতান্ত বন্ধুর মত, দুই-জনে যেন পৃথক হইয়াছিল আবার মিলিয়াছে।

সহসা সরযূ জিজ্ঞাসা করিল, বিয়ে কর্‌লে কোথায়?

এটা যেন নিতান্ত পরিহাসের কথা।

চন্দ্রনাথ বলিল, পশ্চিমে।

কেমন বৌ হ'ল?

তোমার মত।

এই সময় সরযূ বুকের কাছে একটা ব্যথা অনুভব করিল, সাম্‌লাইতে পারিল না, বসিয়াছিল, শুইয়া পড়িল। মুখখানি একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল।

ব্যস্ত হইয়া চন্দ্রনাথ নিচে নামিয়া পড়িল, কাছে আসিয়া হাত ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সরযূ একেবারে এলাইয়া পড়িয়াছিল। তখন শিয়রে বসিয়া ক্রোড়ের উপর তাহার মাথাটা তুলিয়া লইয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া ডাকিল, সরযূ!

সরযূ চোখ খুলিয়া এক মুহূর্ত্ত তাহার স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া দেখিয়া চোখ বুজিল। তাহার ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল, এবং অস্পষ্ট কি বলিল, বোঝা গেল না।

চন্দ্রনাথ অত্যন্ত ভয় পাইয়া জলের জন্য হাঁকাহাঁকি করিতে লাগিল, লক্ষীয়ার মা নিকটেই ছিল জল লইয়া ঘরে ঢুকিল, কিন্তু

কোনরূপ ব্যস্ততা প্রকাশ করিল না! বলিল, বাবু এখনি সেরে যাবে—অমন মাঝে মাঝে হয়।

তাহার পর মুখে চোখে জল দেওয়া হইল, বাতাস করা হইল, বিশু আসিয়া বার-দুই চুল ধরিয়া টানাটানি করিয়া ডাকিল, মা!

সরযূর চৈতন্য হইল, লজ্জিত হইয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া উঠিয়া বসিল। লথীয়ার মা আপনার কাজে চলিয়া গেল। ভয়ে চন্দ্রনাথের মুখ কালি হইয়া গিয়াছিল।

সরযূ হাসিল। বড় ক্ষীণ, অথচ বড় মধুর হাসিয়া বলিল, ভয় পেয়েছিলে?

চন্দ্রনাথের দুই চোখে জল টল টল করিতেছিল, এইবারে গড়াইয়া পড়িল, হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিল; বলিল, ভেবেছিলাম বুঝি সব শেষ হয়ে গেল।

সরযূ মনে মনে ভাবিল, তোমার কোলে মাথা ছিল, সে সুকৃতি কি এ হতভাগিনীর আছে? প্রকাশ্যে কহিল, এমন ধারা মাঝে মাঝে হয়।

তা দেখ্‌চি! তখন হ'তো না, এখন হয়, সেও বুঝি। বলিয়া চন্দ্রনাথ বহুক্ষণ নিঃশব্দে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর পকেট হইতে মরিচা-ধরা একটা চাবির গোছা বাহির করিয়া সরযূর আঁচলের খুঁটে বাঁধিয়া দিয়া বলিল, এই তোমার চাবির রিং, আমার কাছে গচ্ছিত রেখে চ'লে এসেছিলে, আজ আবার ফিরিয়ে দিলাম। চেয়ে দেখ, কখন কি ব্যবহার হয়েচে ব'লে মনে হয়?

সরযূ দেখিল, তাহার আদরের চাবির রিং মরিচা ধরিয়া

একেবারে ময়লা হইয়া গিয়াছে। হাতে লইয়া বলিল, তাকে দাও নি কেন?

চন্দ্রনাথের শুষ্ক ম্লান মুখ অকস্মাৎ অকৃত্রিম হাসিতে ভরিয়া গেল, দুই চোখে অসীম স্নেহ চঞ্চল হইয়া উঠিল, তথাপি নিজেকে সংযত করিয়া বলিল, তাকেই ত দিলাম সরযূ।

সরযূ ঠিক বুঝিতে পারিল না। ক্ষণকাল স্বামীর মুখের পানে সন্দিগ্ধ-দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া মৃদু-কণ্ঠে বলিল, আমি নূতনবৌর কথা বল্‌চি। তোমার দ্বিতীয় স্ত্রী, তাঁকে দাও নি কেন?

চন্দ্রনাথ আর নিজেকে সাম্‌লাইতে পারিল না; সহসা দুই হাত বাড়াইয়া সরযূর মুখখানি বুকের উপর টানিয়া লইয়া বলিয়া উঠিল, তাকেই দিয়েচি সরযূ, তাকেই দিয়েচি। স্ত্রী আমার দুটি নয়, একটি। কিন্তু সে আমার পুরানো হয় না, চিরদিনই নতুন। প্রথম যেদিন তাকে এই কাশী থেকে বিশ্বেশ্বরের প্রসাদী ফুলটির মত বুকে ক'রে নিয়ে যাই, সেদিনও যেমন নতুন আজ আবার যখন সেই বিশ্বেশ্বরের পায়ের তলা থেকে কুড়িয়ে নিতে এসেচি এখনও তেমনি নতুন।

* * * *

সন্ধ্যার দীপ জ্বালিয়া, ছেলে কোলে লইয়া সরযূ স্বামীর পায়ের নিকট বসিয়া বলিল, জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে দেখা না ক'রে তোমার যাওয়া হবে না, আজ রাত্তিরে তোমাকে থাকতে হবে।

চন্দ্রনাথ বলিল, তাই ভাবচি; আজ বুঝি আর যাওয়া হয় না।

সরযূ অনেকক্ষণ অবধি একটা কথা কহিতে চাহিতেছিল, কিন্তু

লজ্জা করিতেছিল, সময়ও পায় নাই। এখন তাহা বলিল, তোমার কাছে আর লজ্জা কি?

চন্দ্রনাথ সরযূর মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। সরযূ বলিল, ভেবেছিলাম, তোমাকে একখানা চিঠি লিখ্‌ব।

লেখ নি কেন, আমি ত বারণ করি নি।

সরযূ একটুখানি ভাবিয়া বলিল, ভয় হ'তো, পাছে তুমি রাগ কর, আবার কবে তুমি আস্‌বে?

যখন আসতে বল্‌বে, তখনি আস্‌ব।

সরযূ একবার মনে করিল, সেই সময় বলিবে, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিয়া দেখিল, মানুষের শরীরে বিশ্বাস নাই। এখন না বলিলে হয় ত বলা হইবে না। চন্দ্রনাথ হয় ত আবার আসিবে, কিন্তু সে সয় ত ততদিনে পুড়িয়া ছাই হইয়া কোথায় উড়িয়া যাইবে। তাই বিবেচনা করিয়া বলিল, তোমার কাছে আমার কোন লজ্জা নেই।

সে কথা ত হয়ে গেল, আর কিছু বল্‌বে?

সরযূ কিছুক্ষণ থামিয়া বলিল, আমার বাঁচতে ইচ্ছে নেই—এমন ক'রে বেঁচে থাকা আর ভাল দেখাচ্ছে না।

চন্দ্রনাথ ভাবিল, ইহা পরিহাসের মত শুনাইতেছে না। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, সরযূর মুখ আবার বিবর্ণ হইয়াছে। সভয়ে কহিল, সরযূ! কোন শক্ত রোগ জন্মায় নি ত?

সরযূ ম্লান-হাসি হাসিয়া কহিল, তা বল্‌তে পারি নে। বুকের কাছে মাঝে মাঝে একটা ব্যথা টের পাই।

চন্দ্রনাথ বলিল, আর ঐ মূর্চ্ছাটা?

সরযূ হাসিল—ওটা কিছুই নয়।

চন্দ্রনাথ মনে মনে বলিল, যা হইবার হইয়াছে এখন সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও তোমাকে আরোগ্য করিব।

সরযূ কহিল, তোমার কাছে একটি ভিক্ষা আছে, দেবে ত?

চাই কি?

নিজের কিছুই চাই না। তবে আমার যখন মৃত্যু-সংবাদ পাবে, তখন—এই সময় সে খোকাকে চন্দ্রনাথের পায়ের কাছে বসাইয়া দিয়া বলিল, তখন একবার এখানে এসে খোকাকে নিয়ে যেয়ো—

চন্দ্রনাথ বিপুল আবেগে বিশ্বেশ্বরকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া মুখ-চুম্বন করিল।

এই সময় বাহির হইতে কৈলাসচন্দ্র ডাকিলেন, দাদা ভাই।

বিশ্বেশ্বর পিতার ক্রোড় হইতে [illegible] কট করিয়া নামিয়া পড়িল—দাদু দাই।

সরযূ উঠিয়া দাঁড়াইল—ঐ এসেছেন।

কিছুক্ষণ পরে কৈলাসচন্দ্র বিশ্বেশ্বরকে ক্রোড়ে লইয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন, চন্দ্রনাথও বাহিরে আসিলেন। কৈলাসচন্দ্র ইতিপূর্ব্বে চন্দ্রনাথকে কখনও দেখেন নাই, দেখিলেও চিনিতেন না, চাহিয়া রহিলেন। খোকা পরিচয় করিয়া দিল। হাত বাড়াইয়া বলিল, ওতা বাবা।

চন্দ্রনাথ প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। কৈলাসচন্দ্র আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, এস বাবা, এস।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

কিন্তু চন্দ্রনাথ যখন বৃদ্ধকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, কাল এদের নিয়ে যাব, তখন কৈলাসচন্দ্রের বক্ষ-পঞ্জরের মধ্যে এককালে শতাধিক কামান-দাগার মত শব্দ করিয়া উঠিল! নিজে কি কহিলেন, নিজের কানে সে শব্দ পৌঁছিল না। কিন্তু চন্দ্রনাথ শুনিল অস্ফুট ক্রন্দনের মত বহুদূর হইতে কে যেন কহিল, এমন সুখের কথা আর কি আছে!

সরযূ এ সংবাদ শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল না, তাহার দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। স্বামীর পদযুগল মস্তকে স্পর্শ করিয়া বলিল, পায়ের ধুলো দিয়ে হতভাগিনীকে এইখানেই রেখে যাও, আমাকে নিয়ে যেয়ো না।

চন্দ্রনাথ বলিল, কেন?

সরযূ জবাব দিতে পারিল না, কাঁদিতে লাগিল। বৃদ্ধ কৈলাসচন্দ্রের কাতর মুখখানি তাহার চোখের উপরে কেবলই ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

চন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমি তোমার স্বামী, আমি যদি নিয়ে যাই, তোমার অনিচ্ছায় কিছু হবে না! আমি শিশুকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

সরযূ দেখিল, তাহার কিছুই বলিবার নাই।

পরদিন প্রাতঃকাল হইতে কৈলাসচন্দ্র বিশ্বেশ্বরকে সে দিনের মত কোলে তুলিয়া লইলেন। দাবার পুঁটুলি হাতে করিয়া শম্ভু

মিশিরের বাড়ি আসিলেন। তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, মিশিরজী, আজ আমার বড় সুখের দিন, বিশুদাদা আজ তার নিজের বাড়ি যাবে। বড় হয়েছে ভাই, কুঁড়ে ঘরে আর তাকে ধ'রে রাখা যায় না।

মিশিরজী আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

কৈলাসচন্দ্র সতরঞ্চ পাতিয়া বল সাজাইয়া বলিলেন, আজ আমোদের দিনে এস, তোমাকে দুবাজী মাৎ ক'রে যাই।

খেলার প্রারম্ভেই কিন্তু কৈলাসচন্দ্র একে একে বল হারাইতে লাগিলেন। গজ চালিতে নৌকা, নৌকা চালিতে ঘোড়া, এমনি বড় গোলমাল হইতে লাগিল। মিশিরজী কহিল, বাবুজী, আজ তোমার মেজাজ ঠিক নেই, বহুত গলতি হোতা। ক্রমে এক বাজীর পর আর এক বাজী কৈলাসচন্দ্র [illegible] পুঁটুলি বাঁধিতে বসিলেন, কিন্তু লাল মন্ত্রীটা [illegible] না। বিশুর হাতে দিয়া বলিলেন, দাদা, মন্ত্রীটি তোমাকে [illegible] আর কখন চাব না। পথে আসিতে যাহার সহিত দেখা হইল, তাহাকেই এই সুখবরটা জানাইয়া দিলেন।

আজ সর্ব্বকর্ম্মেই বৃদ্ধের বড় উৎসাহ। কিন্তু কাজ করিতে কাজ পিছাইয়া পড়িতেছে। দাবা খেলার মত বড় ভুলচুক হইয়া যাইতেছে। যত বেলা পড়িয়া আসিতে লাগিল, ভুলচুক ততই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, সরযূ তাহা দেখিয়া গোপনে শতবার চক্ষু মুছিল। বৃদ্ধের কিন্তু মুখের উৎসাহ কমে নাই, এমন কি সরযূ যখন আড়ালে ডাকিয়া পদধূলি মাথায় লইয়া কাঁদিতে লাগিল,

তখনও তিনি অশ্রু সংবরণ করিয়া হাসিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, মা আমার কাঁদিস নে। তোর বুড়ো জ্যাঠার আশীর্ব্বাদে তুই রাজ-রাণী হবি। আবার যদি কখন এখানে আসিস্, তোদের এই কুঁড়ে ঘরটিকে ভুলে যেন আর কোথাও থাকিস্ নে।

সরযূ আরও কাঁদিতে লাগিল, বুকের মাঝে শুধু সেই দিনের কথা কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল, যে দিন সে নিরাশ্রিতা পথের ভিখারিণী হইয়া কাশীতে আসিয়াছিল। আর আজ!

সরযূ বলিল, জ্যাঠামশাই, আমাকে ছেড়ে তুমি থাকতে পারবে না যে—

কৈলাসচন্দ্র কহিলেন, আর কটা দিন মা? কিন্তু মনে মনে বলিলেন, এইবার ডাক পড়েছে, এতদিনে তপ্ত প্রাণটার জুড়াবার উপায় হয়েছে।

সরযূ চোখ মুছিতে মুছিতে আকুলভাবে বলিল, আমার মায়া-দয়া নেই—

বৃদ্ধ বাধা দিয়া বলিলেন, ছি মা, ও কথা বলো না, আমি তোমাকে চিনেছি।

রাত্রি দশটার সময় সকলে ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গাড়ীর সময় ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে।

বিশ্বেশ্বর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু লাল মন্ত্রীটা তখনো বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়াছিল। বৃদ্ধ নাড়াচাড়া করিয়া তাহাকে জাগাইয়া তুলিলেন। সদ্য নিদ্রোত্থিত হইয়া প্রথমে সে কাঁদিবার উপক্রম করিল, কিন্তু যখন তিনি মুখের কাছে মুখ আনিয়া ডাকিলেন, বিশু, দাদা! তখন সে হাসিয়া উঠিল—দাদু।

দ্বাদশী। পূর্ণিমার দিন তোমার বাড়িতে গ্রামশুদ্ধ লোকের নিমন্ত্রণ করেচি। তখন দাদা ছিলেন, কাজকর্ম্ম সবই তিনি করতেন। আমি কখন কিছু করতে পাই নি, তাই মনে করেছি, বিশুর আবার নূতন ক'রে অন্নপ্রাশন দেব।

চন্দ্রনাথ চিন্তা করিল—কিন্তু সমাজ ?

মণিশঙ্কর হাসিলেন, বলিলেন, সমাজ আমি, সমাজ তুমি। এ গ্রামে আর কেউ নেই; যার অর্থ আছে, সেই সমাজপতি। আমি ইচ্ছা করলে তোমার জাত মারতে পারি, আর তুমি ইচ্ছা করলে আমার জাত মারতে পার। সমাজের জন্যে ভেব না। আর একটা কথা বলি, এতদিন তা বলি নি, বোধ হয় কখন বলতাম না, কিন্তু ভাবচি, তোমার কাছে এ কথা প্রকাশ করলে কোন ক্ষতি হবে না। তোমার রাখাল ভট্‌চাযের কথা মনে হয় ?

হয়। হরিদয়াল ঠাকুরের পত্রে পড়েছিলাম।

আমার পরিবারের যদি কিছু লজ্জার কথা থাকে, শুধু সেই প্রমাণ করতে পারত, কিন্তু সে আর কোন কথা প্রকাশ করবে না, আমি তাকে জেলে দিয়েছি। কিছুদিন হ'ল সে খালাস হয়ে কোথায় চলে গেছে, আর কখন এ দেশে পা বাড়াবে না।

মণিশঙ্কর তখন আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা বিবৃত করিলেন। সে সকল কাহিনী শুনিয়া চন্দ্রনাথের চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল।

তাহার পর পূর্ণিমার দিন খাওয়ানো দাওয়ানো শেষ হইল। গ্রামের কেহই কোন কথা কহিল না। তাহারা মণিশঙ্করের ব্যবহার

দেখিয়া বিশ্বাস করিল যে, একটা মিথ্যা অপবাদ রটনা হইয়াছিল, হয় ত সে একটা জমিদারী চাল মাত্র।

হরকালী আলাদা রাঁধিয়া খাইলেন—তাঁহারা এ গ্রামে আর বাস করিবেন না, বাড়ি যাইবেন। হরকালী বলিলেন, প্রাণ যায় সেও স্বীকার, কিন্তু ধর্ম্মটাকে তিনি কিছুতেই ছাড়তে পারবেন না। ইহা সুখের কথাই হউক আর দুঃখের কথাই হউক, চন্দ্রনাথ তাঁহাদের পঞ্চাশ টাকার পরিবর্ত্তে মাসিক একশত টাকা বরাদ্দ করিয়া দিয়াছেন।

* * * *

উৎসবের শেষে অনেক রাত্রে নাচ-গান বন্ধ হইলে ঘরে আসিয়া চন্দ্রনাথ দেখিল, সর্ব্ব অলঙ্কার ভূষিতা, রাজরাজেশ্বরীর মত নিদ্রিত পুত্র ক্রোড়ে লইয়া সরযূ স্বামীর জন্ত অপেক্ষা করিয়া নিশি জাগিয়া বসিয়া আছে।

আজ পূর্ণিমা।

চন্দ্রনাথ বলিল, ইস্।

সরযূ মৃদু হাসিয়া বলিল, সই আজ কিছুতেই ছাড়লেন না।
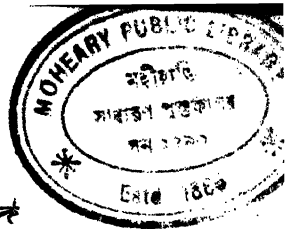
ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সে রাত্রে এক পা এক পা করিয়া বৃদ্ধ কৈলাসচন্দ্র বাটী ফিরিয়া আসিলেন। বাঁধান তুলসী-বেদীর উপর তখনও দীপটি জ্বলিতেছিল, তথাপি এ কি ভীষণ অন্ধকার! এইমাত্র সবাই ছিল, এখন আর কেহ নাই। শুধু মাটির প্রদীপটি সেই অবধি জ্বলিতেছে, তাহারও আয়ু ফুরাইয়া আসিয়াছে। এইবার নিবিয়া যাইবে। সরযূ এটী স্বহস্তে জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছিল।

শয্যায় আসিয়া তিনি শয়ন করিলেন। অবসন্ন চক্ষু দুটি তন্দ্রায় জড়াইয়া আসিল। কিন্তু কানের কাছে সেই অবধি যেন কে মাঝে মাঝে ডাকিয়া উঠিতেছে, 'দাদু!' স্বপ্ন দেখিলেন, যেন রাজা ভরত তাঁহার বুকের মাঝখানটিতে মৃত্যুশয্যা পাতিয়া ক্ষীণ ওষ্ঠ কাঁপাইয়া বলিতেছে, 'ফিরে আয়! ফিরে আয়! ফিরে আয়!'

সকাল-বেলায় শয্যায় উঠিয়া বসিলেন, বাহিরে আসিয়া অভ্যাসবশতঃ ডাকিলেন, বিশু! তাহার পর মনে পড়িল বিশু নাই, তাহারা চলিয়া গিয়াছে!

দাবার পুঁটুলি হাতে লইয়া শম্ভু মিশিরের বাটী চলিলেন। ডাকিয়া বলিলেন, মিশিরজী, দাদাভাই আমার চলে গেছে।

দাদাভাইকে সবাই ভালবাসিত। মিশিরজীও দুঃখিত হইল। দাবার বল সাজান হইলে মিশিরজী কহিল, বাবুজী, তোমার উজীর কি হ'

কৈলাসচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন—তাই ত মিশিরজী, সেটা নিয়ে গেছে। লাল উজীরটা সে বড় ভালবাসত। ছেলেমানুষ কিছুতেই ছাড়লে না।

তিনি যে স্বেচ্ছায় তাঁহার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় দাবাজোড়াটি অঙ্গহীন করিয়াছিলেন, সে কথা সে বলিতে লজ্জা করিল।

মিশিরজী কহিল, তবে অন্য জোড়া পাতি?

পাত।

খেলায় কৈলাসচন্দ্রের হার হইল। শম্ভু মিশির তাঁহার সহিত চিরকাল খেলিতেছে, কখনও হারাইতে পারে নাই। হারিবার কারণ সে সহজেই বুঝিল। বলিল, বাবুজী, খোকাবাবু তোমার বিলকুল ইলিম সাথে লে গিয়া বাবুজী!

বাবুর মুখে শুষ্ক-হাসির রেখা দেখা দিল। বলিলেন, এস আর এক বাজী দেখা যাক্।

বহুৎ আচ্ছা।

খেলার মাঝামাঝি অবস্থায় কৈলাসচন্দ্র কিস্তি দিয়া বলিলেন, বিশু!

শম্ভু মিশির হাসিয়া ফেলিল। বলিল, বাবুজী কিস্তি, বিশু নয়। দুইজনেই হাসিয়া উঠিলেন।

শম্ভু মিশির কিস্তি দিয়া বলিল, বাবুজী, এইবার তোমার দো পেয়াদা গিয়া।

কৈলাসচন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, দাদা, আয়, আয়, শিগ্‌গির আয়। পরে কিছুক্ষণ যেন তাহার অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহি-

লেন। মনে হইতেছিল যেন এইবার একটি ক্ষুদ্র কোমল দেহ তাঁহার পিঠের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে। শম্ভু মিশির বিলম্ব দেখিয়া বলিল, বাবুজী, পেয়াদা নাহি বাঁচানে পার্‌বে। বৃদ্ধের চমক ভাঙ্গিল, তাই ত বোড়ে ছুটো মারা গেল!

তাহার পর খেলা শেষ হইল। মিশিরজী জয়ী হইলেন, কিন্তু আনন্দিত হইলেন না। বলগুলা সরাইয়া দিয়া বলিলেন, বাবুজী, দোসরা দিন খেলা হবে। আজ আপনা তবিয়ৎ বহুৎ বে-দুরস্ত, মেজাজ একদম দিক্‌ আছে।

বাড়ি ফিরিয়া যাইতে দুই প্রহর হইল। মনে হইতেছিল বিশু ত নাই, তবে আর তাড়াতাড়ি কি?

বাড়িতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, লখীয়ার মা একা রন্ধনশালায় বসিয়া পাকের যোগাড় করিতেছে। আজ তাঁহাকে নিজে রাঁধিতে হইবে, নিজে বাড়িয়া খাইতে হইবে। একা আহার করিতে হইবে। ইচ্ছামত আহার করিবেন, তাড়াতাড়ি নাই, পীড়াপীড়ি নাই, বিশ্বেশ্বরের দৌরাত্ম্যের ভয় নাই। বড় স্বাধীন! কিন্তু এ যে ভাল লাগে না। রান্নাঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, এক মুঠা চাল, দুটা আলু, দুটা পটল, খানিকটা ডাল বাটা; চোখ ফাটিয়া জল আসিল, মনে পড়িল দুই বৎসর আগেকার কথা! তখন এমনি নিজের জন্য নিজের রাঁধিতে হইত, এই লখীয়ার মা-ই আয়োজন করিয়া দিত। কিন্তু তখন বিশু আসেও নাই, চলিয়াও যায় নাই।

তালতলায় তাহার ক্ষুদ্র খেলা-ঘর এখনও বাঁধা আছে। দুটো ভগ্ন ঘট, একটা ছিন্ন হস্ত-পদ মাটির পুতুল, একটা দুপয়সা

দামের ভাঙ্গা বাঁশী। ছেলেমানুষের মত বৃদ্ধ কৈলাসচন্দ্র সেগুলি কুড়াইয়া আনিয়া আপনার শোবার ঘরে রাখিয়া দিলেন।

দুপুর-বেলায় আবার গঙ্গা পাঁড়ের বাড়িতে দাবা পাতিয়া বসিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার পর মুকুন্দ ঘোষের বৈঠকখানায় আবার লোক জমিতে লাগিল, কিন্তু প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় বলিয়া কৈলাসচন্দ্রের আর তেমন সম্মান নাই; তখন দিগ্বিজয়ী ছিলেন, এখন খেলামাত্র সার হইয়াছে। সেদিন যাহাকে হাতে ধরিয়া খেলা শিখাইয়াছিলেন, আজ সে চাল বলিয়া দেয়। যাহার সহিত তিনি দাবা রাখিয়াও খেলিতে পারিতেন,সে আজ মাথা উঁচু করিয়া স্বেচ্ছায় একখানা নৌকা মার দিয়া খেলা আরম্ভ করে।

পূর্ব্বের মত এখনও খেলিবার ঝোঁক আছে কিন্তু সামর্থ্য নাই। দুই-একটা শক্ত চাল এখনও মনে পড়ে, কিন্তু সোজা খেলার বড় ভুল হইয়া যায়! দাবা খেলায় তাঁহার গর্ব্ব ছিল, আজ তাহা শুধু লজ্জায় পরিণত হইয়াছে। তবে শম্ভু মিশির এখনও সম্মান করে; সে আর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া খেলে না, প্রয়োজন হইলে দুই-একটা কঠিন সমস্যা পূর্ণ করিয়া লইয়া যায়।

বাড়িতে আজ কাল তাঁহার বড় গোলযোগ বাধিতেছে। লখী-য়ার মা দস্তুরমত রাগ করিতেছে; দুই-এক দিন তাহাকে চোখের জল মুছিতেও দেখা গিয়াছে। সে বলে, বাবু, নাওয়া খাওয়া একে-বারে কি ছেড়ে দিলে? আয়না দিয়ে চেহারাটা একবার দেখ গে!

কৈলাসচন্দ্র মৃদু হাসিয়া কহেন, বেটি রাঁধাবাড়া সব ভুলে গেছি —আর আগুন তাতে যেতে পারি নে।

সে বহুদিনের পুরাণো দাসী, ছাড়ে না, বকা-ঝকা করিয়া এক-আধ মুঠা চাউল সিদ্ধ করাইয়া লয়।

এমন করিয়া এক মাস কাটিয়া গেল।

তাহার পর তিন-চার দিন ধরিয়া কৈলাস খুড়াকে আর কেহ দেখিতে পাইল না। শম্ভু মিশির এ কথা প্রথমে মনে করিল। সে দেখিতে আসিল। ডাকিল, বাবুজী!

লখীয়ার মা উত্তর দিল; কহিল, বাবুর বোখার হয়েছে।

মিশিরজী কক্ষে প্রবেশ করিয়া বিছানার নিকট আসিয়া বলিল, বাবুজী, বোখার হ'ল কি?

কৈলাসচন্দ্র সহাস্যে বলিলেন, হ্যাঁ মিশিরজী, ডাক্ প'ড়েচে তাই আস্তে আস্তে যাচ্চি।

মিশিরজী কহিল, ছিয়া ছিয়া, রাম রাম। আরাম হো যায়েগা।

আর আরাম হবার বয়স নেই ঠাকুর, এইবার রওনা হতে হবে।

কবিরাজ বোলায় ছিলে?

কৈলাস আবার হাসিলেন—আটষট্টি বছর বয়সে কবিরাজ এসে আর কি করবে মিশিরজী!

আটষট্ বরষ বাবুজী! আউর আটষট্ আদ্মী জিতে পারে।

কৈলাসচন্দ্র সে কথার উত্তর না দিয়া সহসা বলিলেন, ভাল কথা মিশিরজী। আমার দাদাভাই চিঠি লিখেছে—ও লখীয়ার মা, জানালাটা খুলে দে ত, মিশিরজীকে পত্রখানা পড়ে শুনাই। বালিশের তলা হইতে একখানা পত্র বাহির করিয়া বহুক্লেশে তিনি

আদ্যোপান্ত পড়িয়া শুনাইলেন। হিন্দুস্থানী শম্ভু মিশির কতক বুঝিল, কতক বুঝিল না।

রাত্রে শম্ভু মিশির কবিরাজ ডাকিয়া আনিল। কবিরাজ বাঙ্গালী, কৈলাসচন্দ্রের সহিত জানা-শুনা ছিল। তাঁহার প্রশ্নের দুই-একটা উত্তর দিয়া কহিলেন, কবিরাজমশায়, দাদাভাই চিঠি লিখেচে, এই পড়ি শুনুন।

দাদাভায়ের সহিত কবিরাজ মহাশয়ের পরিচয় ছিল না। তিনি বলিলেন, কার পত্র?

দাদু, বিশু—লখীয়ার মা, আলোটা একবার ধর্ ত বাছা।

প্রদীপের সাহায্যে তিনি সবটুকু পড়িয়া শুনাইলেন। কবিরাজ মহাশয় শুনিলেন কি না, কৈলাসচন্দ্রের তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই। সরযূর হাতের লেখা, বিশুর চিঠি, বৃদ্ধের ইহাই সান্ত্বনা, ইহাই সুখ! কবিরাজ মহাশয় ঔষধ দিয়া প্রস্থান করিলে, কৈলাসচন্দ্র শম্ভু মিশিরকে ডাকিয়া বিশ্বেশ্বরের রূপ, গুণ, বুদ্ধি এ সকলের আলোচনা করিতে লাগিলেন।

দুই সপ্তাহ অতীত হইল, কিন্তু জ্বর কমিল না, বৃদ্ধ তখন এক জন [illegible]ার ছেলেকে ডাকিয়া বিশুকে পত্র লিখাইলেন, মোট কথা এই যে, তিনি ভাল আছেন, তবে সম্প্রতি শরীরটা কিছু মন্দ হইয়াছে, কিন্তু ভাবনার কোন কারণ নাই।

কৈলাস খুড়ার প্রাণের আশা আর নাই শুনিয়া হরিদয়াল দেখিতে আসিলেন। দুই-একটা কথাবার্তার পর কৈলাসচন্দ্র

বালিশের তলা হইতে সেই চিঠিখানি বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন, বাবাজী পড়।

পত্রখানা নিতান্ত মলিন হইয়াছে, দুই-এক যায়গায় ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, ভাল পড়া যায় না। হরিদয়াল যাহা পারিলেন, পড়িলেন। বলিলেন, সরযূর হাতের লেখা।

তার হাতের লেখা বটে, আমার দাদার চিঠি।

নিচে তার নাম আছে বটে!

বৃদ্ধ কথাটায় তেমন সন্তুষ্ট হইলেন না। বলিলেন, তার নাম, তার চিঠি সরযূ কেবল লিখে দিয়েচে। সে যখন লিখ্‌তে শিখ্‌বে তখন নিজের হাতেই লিখ্‌বে।

হরিদয়াল ঘাড় নাড়িলেন।

কৈলাসচন্দ্র উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিলেন, পড়লে বাবাজী, বিশু আমার রাত্তিরে দাদু দাদু বলে কেঁদে ওঠে, সে কি ভুলতে পারে? এই সময় গণ্ড বহিয়া দুফোঁটা চোখের জল বালিসে আসিয়া পড়িল।

লখীয়ার মা নিকটে ছিল, সে দয়াল ঠাকুরকে ইসারা করিয়া বাহিরে ডাকিয়া বলিল, ঠাকুর যাও, তুমি থাকলে সারাদিন ঐ কথাই বলবে।

আরো চার-পাঁচ দিন কাটিয়া গেল। অবস্থা নেহাৎ মন্দ হইয়াছে, শম্ভু মিশির আজকাল রাত্রি দিন থাকে, মাঝে মাঝে কবিরাজ আসিয়া দেখিয়া যায়। আজ সমস্ত দিন ধরিয়া সংজ্ঞা ছিল না; সন্ধ্যার পর একটু জ্ঞান হইয়াছিল, তাহার পর অর্দ্ধ-

চেতন অৰ্দ্ধ-অচেতন ভাবে পড়িয়াছিলেন। গভীর রাত্রে কথা কহিলেন, বিশুদাদা, আমার মন্ত্রীটা। এবার দে, নইলে মাত হয়ে যাব! শম্ভু মিশির কাছে আসিয়া বলিল, বাবুজী কি বল্‌চে।

কৈলাসচন্দ্র তাহার পানে একবার চাহিলেন, ব্যস্তভাবে বালিশের তলায় একবার হাত দিলেন, যেন কি একটা হারাইয়া গিয়াছে, প্রয়োজনের সময় হাত বাড়াইয়া পাইতেছেন না। তাহার পর হতাশভাবে পাশ ফিরিয়া মৃদু মৃদু বলিলেন, বিশু, বিশ্বেশ্বর, মন্ত্রীটা একবার দে ভাই, মন্ত্রী হারিয়ে আর কতক্ষণ খেলি বল্‌?

এ বিশ্বের দাবা খেলায়, কৈলাসচন্দ্রের মন্ত্রী হারাইয়া গিয়াছে। বিশ্বপতির নিকট তাহাই যেন কাতরে ভিক্ষা চাহিতেছে। শম্ভু মিশির নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল; লখীয়ার মা প্রদীপ মুখের সম্মুখে ধরিয়া দেখিল বৃদ্ধের চক্ষু কপালে উঠিয়াছে, শুধু ওষ্ঠাধর তখনও যেন কাঁপিয়া কহিতেছে, বিশ্বেশ্বর! মন্ত্রী হারা হ'য়ে আর কতক্ষণ খেলা যায়, দে ভাই দে।

* * * *

পরদিন দয়াল ঠাকুর চন্দ্রনাথকে পত্র লিখিয়া দিলেন য রাত্রে কৈলাসচন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে।

শেষ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা